৫৪ বর্ষ ৫ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৮৪ অগ্রহায়ণ ১৩৯১

আত্মজীবনীর খসড়া — সোমনাথ লাহিড়ী — ১

বিয়োগপঞ্জী

দিলীপ বসু — চিন্মোহন সেহানবীশ — ৬২

গল্প

ক্ষেতজননী — অশোককুমার সেনগুপ্ত — ৬৫

পরিচয়ের আড্ডা — শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ — ৭৬

কর্নেলকে কেউ কিছু লেখে না — গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — ৮৪

কবিতাগুচ্ছ

অমিতাভ দাশগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর সেন, শুভ বসু — ১১৩

প্রচ্ছদ

১৯৩১ সালে সোমনাথ লাহিড়ী কৃত 'সাম্যবাদ' বই-এর প্রচ্ছদ চিত্র

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দেবেশ রায়

সম্পাদক কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭ থেকে মুদ্রিত ও 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

আত্মজীবনীর খসড়া

সোমনাথ লাহিড়ী

সোমনাথ লাহিড়ীর জীবন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম। তাঁর ব্যক্তিত্বেরও ছিল এমন এক বিশেষ গড়ন, যে, সমষ্টির জীবন দিয়েই তিনি আত্মজীবনকে বুঝে নিতে চাইতেন। তাই তাঁর নিজের জীবনের কাহিনীও হয়ে উঠত আমাদের সমষ্টিচেতনার এগিয়ে-আসা পেছিয়ে যাওয়ার কাহিনী।

মনে পড়ছে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৬ সাল নাগাদ শারদীয় 'কালান্তর' ও 'পরিচয়'-এর জন্যে লাহিড়ীকে তাঁর আত্ম-জীবনী লিখতে অনুরোধ করেন। দীপেনের জেদে, এবং সম্ভবত তার প্রতি দুর্জয় স্নেহেই, লাহিড়ীকে অগত্যা রাজি হতে হয়। কিন্তু তখনই তাঁর পক্ষে নিজে লেখা অসম্ভব। কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত লাহিড়ীর শ্রুতিলিখনের দায়িত্ব নেন।

শেষ পর্যন্ত, অমিতাভ যেন সত্যিই হয়ে ওঠেন লাহিড়ীর 'লেখক'। তাঁর চেষ্টায় ও শ্রমেই এই বেশির ভাগ লেখা তৈরি হতে থাকে। পরে হয়ত লেখার এই তাড়া লাহিড়ীকেও পেয়ে বসে। তিনি এ-রকম আরো কিছু লেখেন। তাঁর কন্যা সোনালী লাহিড়ী ও কবি ধনঞ্জয় দাশও কিছু লেখার শ্রুতিলিখন নেন। এই সব লেখা শারদীয় 'পরিচয়' শারদীয় 'কালান্তর' শারদীয় 'নতুন পরিবেশ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

আমাদের ধারণা, দীপেনের মৃত্যুর ফলে (১৪ জানুয়ারি, ১৯৭৯) লাহিড়ীর এই ধারার লেখায় ছেদ পড়ে যায়।

আমরা গত সংখ্যাতেই জানিয়েছিলাম—লাহিড়ীর কিছু লেখার পুনর্মুদ্রণ আমরা ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করব। এই আত্মজীবনী গোছের রচনাগুলোকে একসঙ্গে 'পরিচয়'-এ সংগ্রহ করেছিলাম। রচনাগুলি এমন একত্রিত ভাবে পড়লে সেগুলির সম্মিলিত অর্থ হয়ত একসঙ্গে আমাদের কাছে ধরা দেবে। বিশেষত, এখন যখন লাহিড়ী আমাদের মধ্যে নেই।

সম্পাদক

উত্তরণ

নদে জেলার শান্তিপুর। বয়স সাত-আট বছর। অষ্টমী পুজোর দিন বন্ধু হাবুর সঙ্গে ঠাকুর দেখে বেড়াচ্ছি।

ছোট্ট একটা ঠাকুর। সাজসজ্জা খুবই দীন। কতগুলো আধ-ন্যাংটা ছেলে-মেয়ে কাঁসরের অভাবে প্রাণপণে থালা পিটচ্ছে। পুরুতমশাই পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করছেন।

ফিরে আসার আগে ঠাকুর নমস্কার করতে যাচ্ছি, হাবু হাত চেপে ধরল। সিউরে ওঠা গলায় বলল: করছিস কি? আমরা বামুন না! এটা যে বাগদিদের ঠাকুর—একে কখনো নমস্কার করতে আছে?

মানুষে মানুষে জাতের তফাৎ হয়, একজন অন্যজনকে ছোঁয় না, তা জানতাম। কিন্তু ঠাকুরেরও যে জাত আছে, সে কথা এই প্রথম শুনলাম। ঠিক বুঝলাম না। স্বর্গের আকাশে যে মেঘটার ওপর বামুনদের ঠাকুরের বাড়ি হবে, বাগদিদের ঠাকুররা কি সেই মেঘে জায়গা পাবে না?

রাজনীতিতে, বিশেষ করে মার্কসবাদী রাজনীতিতে ঢুকলাম কেন বলতে গিয়ে আগে অনেক জায়গায় লিখেছি যে, কলেজ জীবনে ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব থেকে বাকুনিনে পৌঁছাই আর বাকুনিন থেকে মার্কস-এ। কিন্তু তা ছিল অধ্যয়ন ও চিন্তনের ফল। ধর্মবিরূপতার ঝোঁক জন্মাল কি বই পড়ে, সমালোচকদের আলোচনা শুনে, তদানীন্তন কালেজি ফ্যাশনের হাওয়ায় হাওয়ায়? না কি শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত জীবনের অচেতন বা অর্ধচেতন মনের গভীরে কোনো ঘটনা বা ঘটনাবলী এমন কোনো দাগ কেটেছিল যা দিনে দিনে চিন্তার মধ্যে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল।

ছ-সাত বছর থেকে এগারো-বারো বছর বয়স পর্যন্ত শান্তিপুরে থাকতাম। বাঙলাদেশের অন্য অনেক মফস্বল শহরের তুলনায় শান্তিপুরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ, এটা ছিল গোস্বামী মহাপ্রভুদের অন্যতম পীঠস্থান। বারো-মাসে তেরো পার্বন, কীর্তনগান কথকতা ধর্মীয় মেলা ইত্যাদি চলেছে তো

চলেইছে। একদিকে ধর্ম ও পৌরাণিকতার মিশ্রিত সংস্কার আর অন্যদিকে পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে শিশুমনের কাছে এক অবাধ কল্পনার অফুরন্ত উৎস।

খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফিরবার পথে কাছিমাপাড়ার বাঁশবাগানের কাছে এলেই অর্জিত সংস্কারগুলোর চাপে প্রত্যেকটা বাঁশগাছেই একটা করে ভূত দেখতে পেতাম। ছোট বড় সবার কাছে শুনেছিলাম, সঙ্গে লোহা থাকলে ভূতে কিছু করতে পারে না। শরীরের মধ্যে বেল্টের পেরেকটাই একমাত্র লোহা। দুহাতে সেটাকে চেপে ধরে পাড়ার ঠাকুর গোকুলচাঁদের নাম নিতে নিতে চোখ বুজে ছুটে বাঁশবনটা পার হয়ে যেতাম।

আবার, নাটমন্দিরের আঙিনায় বাঈজীদের ঢপকীর্তন শুনে বর্ষার জলভরা বাঁওরের ধার দিয়ে যখন গুন গুন করে চলতাম—

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী,
ও যার বিশাল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি—

তখন কল্পনায় এই পথই হত নন্দপুরের পথ, বাঁওরের জলে দামাল ছেলেদের সঙ্গে জলকেলি, গঙ্গার ধারে মাঠে মাঠে বাঁশি বাজিয়ে চৈত্র দিনের অলস বায়ে আধেক ঘুমে স্বপ্ন দেখা।

পরীক্ষার দিন কাছিমাপাড়া সযত্নে এড়িয়ে—কারণ সবাই বলে দিয়েছিল কাছিম ঘোর অযাত্রা—সোজা রঘুনাথের মন্দিরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। আবার শীতের দিনের সন্ধ্যাবেলা নাটমন্দিরে কথকঠাকুরের সুললিত সুরেলা উচ্চারণে সীতার বিরহের বর্ণনা মা-কে মনে করিয়ে দিত (বাবা কলকাতায় চাকরি করতেন, অর্থাভাবের জন্য অনেকদিন পর পর বাড়ি আসতেন)। চোখ সজল হয়ে উঠত, আমি হতাম লবকুশের মতো বীর, একদিন মায়ের দুঃখ ঘোচাব।

এমনিধারা সংস্কারের বন্ধন আর কল্পনার মুক্তি—এর মধ্যে বাগদিপাড়ার মত ঘটনা মনে মনে হঠাৎ কি যেন দুর্জ্ঞেয় জটিলতার সৃষ্টি করত, হিসেব মেলাতে পারতাম না।

দীনু আমার সমবয়সী। কিন্তু তার তখনই পৈতে হয়ে গেছে। তার কিছুদিন পরে, তখনও তার মাথায় ভালো করে চুল গজায় নি, একদিন দুজনে রঘুনাথ মন্দিরের পাশে ছুটোছুটি খেলছি। পরিশ্রান্ত হয়ে আমরা মন্দিরের সিঁড়িতে বসলাম। একজন বৃদ্ধা মহিলা সবে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরে এগিয়ে এলেন, হাতে একটি জলভরা ছোট বাটি। দীনুকে যেন ছুঁয়ে

না ফেলেন এমনভাবে আলগোছে বাটিটি তার পায়ের কাছে নামিয়ে দিলেন —নতুন বামুনের তেজ বেশি, তার পাদোদক চাই। দীনুর পায়ের আঙুলে পাঁচড়া, বুড়ো আঙুলের তলে ধূলোমাটি, তাই নিয়েই অম্লান বদনে এমনকি অবলীলাক্রমে আঙুলের সবটা ডুবিয়ে দিল জলের বাটিতে। বৃদ্ধা সাগ্রহে সানন্দে সেই জল পান করলেন, তারপর দূর থেকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

দীনু ভাবল সে বৃদ্ধার উপকারই করল। আমি কিছু ভাবি নি, তবে মনে মনে আছে গা-টা ঘিনঘিন করে উঠেছিল।

বিসর্জনের মিছিল। পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে জাঁক-জমকের পুজো। কর্তার বড় ছেলে শ্রীকান্তবাবু আমাদের মিছিলের নেতা (পরবর্তীকালে ইনি কংগ্রেসের নেতা হয়েছিলেন)। ঢাক ঢোল কাঁসি তার ওপর ইংরিজি বাজনা। লোহার মশালে ঘুঁটে জ্বালিয়ে আলোয় আলোময়, মাঝে মাঝে বোধহয় দু-একটা অ্যাসিটিলিন বাতিও ছিল।

ডাকঘরের মোড়ের একপাশে মুসলমানদের প্রধান মসজিদ। ঠিক মোড়ে না দাঁড়িয়ে মিছিলটাকে দাঁড় করানো হল প্রায় মসজিদের কোল ঘেঁষে। অনেকক্ষণ দাঁড়াল সেখানে। শ্রীকান্তবাবু বললেন—বাজা, বাজা, যত জোরে পারিস বাজা। আর তার সঙ্গে চিৎকার—জয় মা দুর্গা!

সারা পথের মধ্যে, মনে হল, এখানেই বাজনার উৎসাহ সবচেয়ে বেশি, থামতেই চায় না। আমার কিন্তু মনে ভয় আছে, এখনও অনেক পথ বাকি, অথচ বেশি রাতে ফিরলে মা বকবেন। দাদার বয়সির একজনকে দেরির কারণ শুধোলাম। তিনি বললেন—দেখছিস নে, নেড়েদের মসজিদ? বেটারা বলে—মসজিদের সামনে নাকি বাজনা চলবে না। ওদের একটু জানান দিয়ে যাচ্ছি, মা দুর্গার কি তেজ!

ধর্ম মানে তা হলে ভালবাসা নয়, হিংসে? ঠিক তাই বুঝেছিলাম কিনা জানি না, তবে ভালো লাগে নি।

আমরা ভাইবোনেরা ভূতি দি-কে খুব ভালোবাসতাম। সে আমাদের বাড়ি কাজ করত আর সন্ধ্যেবেলা পাড়ার খবর থেকে ভূতের গল্প পর্যন্ত সব শোনাত। ভূতি-দির মা বুড়ি, চোখে তত ভালো দেখতে পায় না, বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে কাজ করত। বর্ষার রাতে বাবুদের অতিথি কুটুম্ব এসেছে। বুড়ি গেল কুয়ো থেকে জল আনতে। লণ্ঠনটা সঙ্গে নিতে দেয় নি, কারণ জলের

ছাঁটে চিমনি ফেটে যাবে। একে অন্ধকার, তাতে পিছল, তার ওপর কুয়োর পাটও ভাঙা। বেচারা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

হৈ চৈ শুনে অনেক লোক এসেছিল। কিন্তু ঐ দুর্যোগের রাত্রে অন্ধকার কুয়োর মধ্যে নেমে বুড়িকে তোলার মতো ঝুঁকি নিতে কেউই এগিয়ে এল না।

এসেছিল সাধু গোপাল। সে জাতে চাঁড়াল। কিন্তু গেরুয়া পোশাক, মাথায় পাগড়ি, হাতে বর্শা, সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে বেড়ায়, গাঁজা খায়। যে তাকে ডাকে সে তারই উপকার করে, সেই কারণে লোকে তাকে বলে 'গোপাল ক্ষ্যাপা'।

গোপালের ভয়ডর নেই। সে তখনই কুয়োয় নামতে রাজি। কিন্তু বাঁড়ুজ্যে গিন্নি নামতে দিলেন না, কিছুতেই নামতে দিলেন না। কারণ গোপাল চণ্ডাল—সে কুয়োয় নামলে কুয়ো পতিত হয়ে যাবে।

ভূতিদি-র কান্না আমি দেখেছিলাম—সারারাত সারাদিন। তার সঙ্গে আমরা ভাইবোনেরাও কেঁদেছিলাম।

সেই কান্নাই কি আমার অবচেতনাকে চৈতন্যে উত্তরণ করিয়েছিল?

শান্তিপুরে থাকতে থাকতে কয়েকবার কলকাতায় এসেছিলাম নিশ্চয়ই। তবে কোনোবারই বেশিদিন থাকি নি। সেখানকার পাট চুকিয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় এলাম সম্ভবত বিশ সালের শেষ দিকে। বাড়ির লোকেরা আমার কিছু আগেই কলকাতায় চলে এসেছিলেন, আমাকে কিছুদিন একাই শান্তিপুরে থেকে ইস্কুলের হিসাব চুকোতে হয়েছিল।

তারপর একদিন এক জেঠতুতো ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতা রওনা দিলাম। শেয়ালদা স্টেশনের বাইরে এসে রাস্তায় পা দিতেই কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল। আগে যখন আসতাম, মনে হত, সব রাস্তাতেই যেন সবদিন দুর্গাপূজার মিছিল। দিনের আলোর চেয়েও ঝলমল করতে থাকত। এবারে কিরকম নিষ্প্রভ।

সঙ্গী দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ধারণাটা ঠিক কিনা। তিনি হেসে রাস্তায় গ্যাসলাইটগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে বললেন—ঐ ছাখ। যা দেখলাম, তা সত্যি অদ্ভুত। তখনকার দিনের রাস্তার লাইটপোস্টের মাথায় কাঁচের বাক্সের মধ্যে গ্যাসের ম্যান্টেলগুলো কিছু জ্বলছে না। তার বদলে সেখানে দুটো করে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। স্বভাবতই গ্যাসের তুলনায় সে আলো খুবই ম্লান। গ্যাসের বদলে মোমবাতি কেন—শুধোলাম।

তিনি বললেন—জানিস না, গ্যাস কোম্পানিতে স্ট্রাইক হয়েছে, তাই গ্যাস জ্বলছে না।

স্ট্রাইক কথাটা এর আগে শুনি নি। কলকাতায় স্থায়ীভাবে পদার্পণের প্রথম দিনই যার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি, তার নাম স্ট্রাইক।

১৯২১ সালের গোড়ায় হেয়ার ইস্কুলে ভর্তি হলাম। আর তখনই আরম্ভ হোল অসহযোগ আন্দোলন। ইস্কুল-কলেজ সর্বত্র স্ট্রাইকের পর স্ট্রাইক। ভয়ে, ভয়ে আমাদের ইস্কুলে তো ছুটিই দিয়ে দিল অনির্দিষ্ট কালের জন্য। আর তার পরে গোটা যুগটাই হল হরতালের যুগ—কলেজ-ইস্কুলকেও ছাপিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বার অভিযান। ১৯২৩ সালে আমি জীবনে প্রথম গল্প লিখি। ছাপা হয় হেয়ার ইস্কুল ম্যাগাজিনে। গল্পের নাম 'হরতাল'।

আমার গুরু

ছেলেবেলায় স্কুলে পড়ার গোড়ার দিকে আমরা থাকতাম শান্তিপুরে। ৮।৯ বছর বয়সের সময় একবার কদিনের জন্যে কলকাতায় আসি—বোধহয় এই আমার কলকাতায় দ্বিতীয় পদার্পণ। উঠেছিলাম দূর সম্পর্কের এক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে।

জ্যাঠামশাইয়ের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে যে ছেলেটি সর্বকনিষ্ঠ সে আমার সমবয়সী। কিন্তু সেবার আমার বেশি যোগাযোগ হল বুড়োদার সঙ্গে। তিনি আমার চেয়ে বেশ উঁচু ক্লাসে পড়েন, বয়সেও ৪।৫ বছরের বড়। তাহলেও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘুরতাম।

ঐ বাড়িতে নিয়ম ছিল—সকালের জলখাবারের জন্যে বড় ছেলেরা পাবে দু-পয়সা আর ছোটোরা এক পয়সা। সে অনুসারে সকালবেলা আমি পেলাম এক পয়সা আর বুড়োদা পেলেন দু-পয়সা। পয়সা নিয়ে বাড়ির বাইরে আসছি, বুড়োদা বললেন—তোর পয়সাটা দে তো। শঙ্কিত মনে পয়সাটা তাঁর হাতে তুলে দিলাম, মনে হল পয়সাটা বোধহয় মারা গেল। বুড়োদা নিয়ে গেলেন একটা চায়ের দোকানে—সেখানে সেদ্ধ ডিম বিক্রি হয়, দাম তিন পয়সা। আমার এক আর বুড়োদার দুই মিলিয়ে সেদ্ধ ডিম কেনা হল একটা। দোকানদারই ডিমটাকে দুখানা করে নুনমরিচ লাগিয়ে

দিল। বুড়োদা নিজের জন্যে ছোটো ভাগটা রেখে বড় ভাগ তুলে দিলেন আমার হাতে।

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। নিজের স্বার্থ এমন অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে—আমার শিশুমনের কাছে সে এক বিরাট বিস্ময়। সেদিন থেকে বুড়োদা আমার গুরু।

পরে বেশ কয়েক বছর বুড়োদার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল না। কলকাতার স্কুলে পড়েছি, কলেজে ঢুকেছি, তখনো যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব প্রধানত সমবয়সীদের সঙ্গে। কাজকর্ম, চিন্তাভাবনার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে গুরুর দরকার। বন্ধুরাই তখন প্রধান।

সকল মানুষের জীবনে এমন এক সময় আসে যখন সে মনে করে সে পৃথিবীর সমবয়সী। জীবনের সেই অবস্থাটাকেই আমরা বলি তারুণ্য বা যৌবনে পদার্পণ। তরুণ মনের কাছে পৃথিবীর সবকিছুতেই তার সমান অধিকার, সে কোনোমতেই পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। তাই যারা সবে তারুণ্যের চৌকাঠ পেরুল, আর যারা তার মধ্যগগনে, তাদের মধ্যে অধিকার ও আয়াসের এমন একটা সহানুভূতি গড়ে ওঠে যে বয়সের ব্যবধানটা নগণ্য হয়ে পড়ে। এইভাবেই বুড়োদা একদিন আমার বন্ধু হয়ে গেলেন।

প্রশ্নের যুগ

যুগটা ছিল সন্দেহ আর অনুসন্ধিৎসার যুগ। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে তখন ৮।১০ বছর গড়িয়ে গেছে। যুদ্ধের রায় ও নির্মম বাস্তবতার আঘাতে ইয়োরোপের মানুষের মনে, বিশেষ করে তরুণ সমাজের মনে, এতদিনকার প্রচলিত অনেক বিশ্বাস সম্বন্ধেই প্রশ্ন জেগেছে। একদিকে যেমন 'সিনিসিজম' প্রশ্রয় পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অচল-প্রতিষ্ঠ সমস্ত সংস্কারই নাড়া খেয়েছে। ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজনীতি সকল বিষয়েই প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি এবং সম্মানিত নিয়ম-নীতিগুলি সবই প্রশ্নের আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। নতুনের অন্বেষণের এই ঢেউ ইয়োরোপ থেকে আমাদের দেশেও তখন পৌঁছে গেছে। এবং স্বভাবতই তা আমাদের মতো তরুণ মনকে নাড়া দিয়েছে সবচেয়ে বেশি।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তখনো আমার যোগাযোগ হয় নি। তাই প্রথমে প্রশ্ন জাগল সাহিত্য আর ধর্ম নিয়ে। সাহিত্যে যৌন রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আর ধর্মে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে।

সন্ত্রাসবাদী বীরত্ব টানেনি কেন

প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যোগ না থাকলেও যে কোনো প্রগতি-ভক্ত তরুণের মতো গান্ধীবাদী আন্দোলনের আপসকামী রূপ সম্বন্ধে মনে বিরক্ত ছিল। তার স্বাভাবিক পরিণতিতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বীরত্ব হয়ত আমাকে আকৃষ্ট করত, কিন্তু করল না একটা কারণে।

তখন বোধহয় ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। কলেজের দেয়ালে একদিন দেখলাম অনেকগুলো ইশতাহার লটকানো। ছাপানো ইশতাহার। মাথায় মা কালীর ছবি, আর বাকি সব ইংরেজিতে লেখা। যতদূর মনে পড়ে গোড়ার লাইনে লেখা ছিল—"In the name of Mother Kali we warn all Indian Inspectors and Sub-Inspectors of Police !" সাবধানবাণীর মোদ্দা কথাটা এই ছিল যে দেশী ইনস্পেক্টর ও সাব-ইনস্পেক্টররা বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করলে মা কালীর নামে তাদের গুলি করে মারা হবে। তলায় কোনো পরিচিত সন্ত্রাসবাদী দলের নাম ছিল, এখন নামটা মনে নেই।

প্রচণ্ড হাসি পেল, সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা উবে গেল। শেষকালে মা কালীর নামে! পৌত্তলিকতার মতো প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাকে যে আন্দোলন্ প্রণতি জানায় তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ থাকতে পারে কি করে?

বুড়োদাকে বলাতে তিনি হেসে বললেন—হ্যাঁ সব টেররিস্ট দাদারাই হিন্দু, আর তাদের অনেকের কাছেই ঠাকুরদেবতা আর গীতা-উপনিষদ হল প্রেরণার উৎস! তুই তো শুধু ছবি দেখেছিস! আমি শুনেছি বিপিনদার দলে ভর্তি হতে হলে দীক্ষার দিন নিজের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে মা কালীর পায়ে উৎসর্গ করতে হয়।

তারপর বোঝালেন—ধর্মের নামে ডাক দিলেও তারা যখন ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধেই ডাক দিচ্ছে তখন ধর্মটা গৌণ। শুধু তাই দিয়ে টেররিস্ট আন্দোলনের সার্থকতা বা অসার্থকতা বিচার করা যায় না। টেররিস্ট আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা হল যে, তা শুধু ব্যক্তির বীরত্বের ওপরই নির্ভরশীল, গণ-আন্দোলনের ওপর তাদের ভরসা নেই। সেজন্যেই ঐ আন্দোলন সফল হবে না।

বাকুনিন থেকে মার্কস

সে যাই হোক, আলোচনাটা উঠেছিল কালীঠাকুর নিয়ে—তাই বুড়োদা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি শুধু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, না ধর্মেরই বিরুদ্ধে?

বললেন—আমার মনে হয় ধর্মটাই ফাঁকি। এ সম্বন্ধে অনেক কষ্টে একটা ভালো বইয়ের খোঁজ পেয়েছি—পেলে পড়ব, তোকেও পড়তে দেব।

বইটা বাকুনিনের লেখা শৈশব ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে। দুজনে মিলে মন দিয়ে পড়লাম। পৌত্তলিকতাবিরোধিতা থেকে পৌঁছলাম নিরীশ্বরবাদে—মনে হল বহুদিনের একটা বাঁধনই যেন ভেঙে পড়ল। অবিশ্যি এনার্কিস্ট রাষ্ট্রের ধারণাটা তেমন মাথায় ঢোকে নি।

তবে দারুণ লাভ হল একটা। বাকুনিনের লেখাতে পেলাম কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' বইয়ের উল্লেখ। অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাকুনিন মার্কসের বইটিকেই প্রামাণ্য গ্রন্থের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, বইটি একটি "magnificent work."

মার্কসের নাম শুনেছি, কিন্তু কোনো বই পড়ি নি। বই পাওয়া খুব দুষ্কর ছিল কারণ 'সী কাস্টমস' আইনের নামে তখন ভারতবর্ষে মার্কস, লেনিন ও স্টালিন সকলের সব লেখারই প্রবেশ নিষেধ।

বই খুঁজছি এমন সময় কলকাতায় বসল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯২৮)। বছরটা ছিল ঝড়ের বছর। চটকল ধর্মঘট, লিলুয়া রেল ধর্মঘট, বামুনগাছিতে রেল শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানো, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বর্ধিত উচ্ছ্বাস—সব মিলে একটা বিস্ফোরণের দিকে এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু কংগ্রেসে মতিলাল নেহরু ও গান্ধীজীর চাপে স্বাধীনতা প্রস্তাব মুলতবি রাখার সিদ্ধান্ত হল—ঝোঁক রইল ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দিকে।

তখনো আমি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হই নি। তাই কংগ্রেসের অধিবেশন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই নি। বুড়োদার অল্প কিছু যোগ ছিল ডঃ ভূপেন দত্তর সঙ্গে, তিনি খবর দিলেন ঐ সময়েই রামমোহন লাইব্রেরি হলে সোশ্যালিস্ট সম্মেলন হবে—সভাপতি জওহরলাল আর অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষ ডঃ দত্ত।

বুড়োদার সুপারিশে আমিও সোশ্যালিস্ট সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হয়ে গেলাম, যদিও সোশ্যালিজম কি তা তো তখনো জানিইনে, এমন কি কোনো রাজনৈতিক সম্মেলনেও তার আগে কখনো যোগ দিই নি।

১৯২৮-সোস্যালিষ্ট সম্মেলন

ডেলিগেট এসেছিলেন নানা প্রদেশ থেকে। বিভিন্ন ভাষাভাষী এত মানুষের একসঙ্গে জটলা আর আমি তার অন্যতম—এ আমার কাছে এক

অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। তাদের অনেকের হিন্দি কথা একবর্ণও বুঝিনে তবু রোমাঞ্চিত হয়ে শুনি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডঃ দত্ত অনেক পৃষ্ঠাব্যাপী ছাপানো ইংরেজি বক্তৃতা পড়ে গেলেন—ইংরেজি উচ্চারণ খুবই বাঙালীর মতো—আর তার মধ্যে অনবরত "ক্লাস স্ট্রাগল", "ক্লাস কনশাসনেস" আর "মার্কসিজম"। সোশ্যালিজমের বিশেষ কোনো খবর রাখিনে তাই মানে বিশেষ বুঝলাম না, কিন্তু সেই জন্যেই ডঃ দত্তের পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা হল অগাধ।

সে তুলনায় জওহরলাল কিন্তু নিরাশ করলেন। অল্প কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। সে কথার মধ্যে সোশ্যালিজমের ঐতিহাসিক নিয়তি বা ভারতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে তার যোগাযোগের বিবরণ বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে পড়ে না। তবে একটা কথা তিনি বারে বারে বলেছিলেন এবং সেজন্যেই সেকথাটা মনে আছে যে, "Socialism is something which requires ice-cold thinking" টেররিস্ট বিপ্লববাদের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে চিন্তাভাবনার ওপর জোর দেওয়া নিশ্চয়ই সময়োপযোগী হয়েছিল, কিন্তু ভাবনার ধারাটা আর একটু বিশদ হলে বোধহয় ভালো হত। জওহরলাল সভাপতির ভাষণ দিয়েই চলে গেলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস নেতা শ্রীশ্রীপ্রকাশ। তাঁর বক্তৃতার একটা কথাই মনে আছে, বলেছিলেন—সাম্যবাদ হলে কারও মাইনা ১০০ টাকার কম হওয়া উচিত নয় আর কারও ৫০০ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়।

ডেলিগেট আর অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য সবাইকে নিয়ে সাবজেকট কমিটির মিটিং বসল পরদিন দুপুরে। বুড়োদা গোড়ায় আসতে পারেন নি, আমি একাই হাজির। কাউকে চিনি না, সাবজেকট কমিটি কি বস্তু তাও জানি না। যাই হোক, দেখলাম অনেকে অনেক প্রস্তাব দাখিল করেছেন এবং তার মধ্যে কোনটা সভায় উপস্থিত করা হবে তাই নিয়ে বিচার চলছে। চলতে চলতে একজন পাঞ্জাবী ডেলিগেটের কাছ থেকে একটা প্রস্তাব এল—যতদূর মনে পড়ে তার মর্মার্থ ছিল: ভারতে স্বাধীনতা তথা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সশস্ত্র পন্থাসহ সকল রকম পন্থাই গ্রহণ করতে হবে। প্রস্তাবকের কোনো সমর্থক ছিল না বলে প্রস্তাবটা বাতিল হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ আমি বলে বসলাম আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি। একটু গোলমাল বেধে গেল, ডঃ দত্ত আমাদের নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন। কে কার কথা শোনে। এমন সময় দেখি বুড়োদা কখন এসে গেছেন। আমাকে একটু পাশে টেনে নিয়ে

গিয়ে বললেন—প্রকাশ্য সম্মেলনে এ রকম প্রস্তাব আনার সময় এখনো হয় নি। দেখছই তো সমাজতান্ত্রিক যুব আন্দোলন এখন প্রাথমিক স্তরে—আইনসঙ্গত আন্দোলনের সুযোগ নিয়েই তাকে এখন অগ্রসর হতে হবে। বুড়োদার কথা বুঝতে অসুবিধা হল না, প্রস্তাব প্রত্যাহার করলাম। ডঃ দত্তও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

এই সম্মেলন থেকে আর কিছু লাভ হোক না হোক সোশ্যালিজম আর মার্কসিজম কি তা জানবার আগ্রহ খুবই বাড়ল। বুড়োদা তখন একটা নামকরা স্বদেশী রাসায়নিক কারখানায় কেমিস্টের কাজ করেন। কাজেই মার্কসবাদ সম্বন্ধে বই খুঁজে বের করার দায়িত্ব পড়ল প্রধানত আমার ওপর। খুঁজতে খুঁজতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে (বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরি) পেলাম দুখানা বই। যতদূর মনে আছে দুখানারই সম্পাদক রিয়াজানভ—আগেকার মার্কস এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটের কর্তা। একখানার নাম কাল' মার্কস অ্যাণ্ড ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস', আর একখানা কাল' মার্কস—ম্যান, থিঙ্কার অ্যাণ্ড রেভোলিউশানিস্ট।

মার্কসবাদের বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় বইটাতে মার্কসের নিজের কোনো লেখা নেই কিন্তু মার্কসবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি লেখা আছে। তার মধ্যে প্রধান ছিল লেনিনের লেখা 'মার্কস-বাদ'। এই লেখাটি যেন আমাদের দুজনের হাতেই স্বর্গ এনে দিল, কারণ মার্কসবাদ সম্বন্ধে এত সরল সংক্ষিপ্ত অথচ সর্বাঙ্গীণ প্রবন্ধ বোধহয় আর কোথাও নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে লেনিনের লেখাতেই আমাদের মার্কসবাদের বর্ণপরিচয়। ভালো মন্দ আরও কিছু বই ক্রমে ক্রমে পড়ে ফেললাম—সোশ্যালিজম সম্বন্ধে পরিচয় বাড়তে লাগল।

এমন সময় এল ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাস। সারা ভারতকে সচকিত করে ভগত সিংয়ের বোমা ফাটল দিল্লীর আইনসভায়। রাজনৈতিক কর্মী আর শ্রমিক আন্দোলনের পায়ে নতুন করে বেড়ি পরাবার জন্যে আসেম্বলিতে তখন শ্রম বিরোধ বিল ও জননিরাপত্তা বিল পাশ করানোর চেষ্টা চলছে। স্বয়ং স্যার জন সাইমন উপস্থিত। দমনপীড়নে মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ করে রেখে অনায়াসে বিল পাশ করিয়ে নেবে ভেবেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

ভগত সিংয়ের সিংহগর্জন তাদের সে আশায় ছাই দিল। শুধু বোমার বিস্ফোরণই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম আপাত নীরব দেশবাসীর

আসন্ন বিস্ফোরণ সম্বন্ধে ভগত সিংহের ইশতাহারের সেই অগ্নিময় ভবিষ্যদ্বাণী :

"From unber the seeming stillness of Indian humanity a veritable storm is about to burst forth in all its elemental fury"

আমাদের মনের তারে বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে হল, সমস্ত স্তব্ধতাকে বাঙ্ময় করে তুলতে হবে, প্রকাশ করতে হবে মনের সমস্ত আবেগকে, আক্ষরিক রূপ দিতে হবে সমস্ত চিন্তাভাবনাকে।

আমরা মানে আমরা কজন আত্মীয় বন্ধু ইত্যাদি। বাইরের কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে আমাদের বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। প্রধানত সাহিত্যোৎসাহী কয়েকজন তরুণরূপেই আমরা জমা হয়েছিলাম, কিন্তু সমাজের অগ্নিগর্ভ পরিবেশ তার ওপর রাজনীতির ছায়া ফেলল।

হাতে লেখা 'অভিযান'

কীই বা আমরা করতে পারি? শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, একখানা হাতে লেখা পত্রিকা বার করা হবে—নাম 'অভিযান'।

তখন বি. এসসি. পরীক্ষা দিয়েছি, হাতে সময়ও যথেষ্ট। 'অভিযানে' কবিতা আর গল্পের প্রাবল্যই বেশি ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনীতি, সমাজনীতি এবং মাসিক রাজনৈতিক পর্যালোচনা থাকত অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বুড়োদা ছিলেন আমাদের বৈদেশিক সম্পাদক। কারখানার ছুটির পর ইয়া মোটা চুরুট মুখে দিয়ে বসে কাটিং-এর পর কাটিং ঘাঁটতেন—বিলাতের শ্রমিক সরকার যে রক্ষণশীলদের বেড়ার বাইরে যেতে পারবে না তা বোঝাবার জন্যে। কাটিং রাখা, ইনডেকস করা ইত্যাদি তাঁর কাছেই শিখলাম। তাঁর প্রেরণায় তখন শুধু লেনিনের 'ইম্পিরিয়ালিজম'ই নয়, ইবসনের 'ইম্পিরিয়ালিজমই' মায় মাকিয়াভেলির 'দি প্রিন্স' পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি। 'ক্যাপিটাল' তখনো পড়ি নি, কারণ পাই নি, কিন্তু ম্যাকসবীয়ারের 'গাইড টু দি স্ট্যাডি অফ মার্কস' থেকে অনেকখানি আন্দাজ পেয়েছি। স্তালিনের 'লেনিনিজম' বইটাও পেয়ে গিয়েছিলাম। দুঃসাহসিক পরিকল্পনা মাথায় এল—বাঙলা ভাষায় মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বই লিখব। তখনো পর্যন্ত এ কাজ করতে কেউ এগোয় নি, কিন্তু আমি বেপরোয়া। 'সাম্যবাদ' নাম দিয়ে ধারাবাহিকভাবে হাতের লেখা 'অভিযান'-এ খসড়া তৈরি করতে লাগলাম।

'আমরা ভুলিব না'

এল ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯। উপবাসের অস্বাভাবিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তিলে তিলে যতীন দাসকে হত্যা করল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। সম্পাদকীয় লেখার ভার পড়েছিল আমার উপর। কি লিখেছিলাম সবটা মনে নেই, তবে শেষ ক-লাইন অনেকটা এই রকম ছিল :

"আমরা ভুলিব না। 'টেল অফ টু সিটিজ'-এর মাদাম দেফার্জের মতো জাতি তার জীবনের এমন প্রতিটি ঘটনায় গ্রন্থির পর গ্রন্থি ধাঁধিয়া রাখিবে—এবং একদিন প্রতিটি গ্রন্থির জন্য ভয়ঙ্কর কৈফিয়ৎ দাবি করিবে। সে দাবিকে তখন অস্বীকার করার উপায় থাকিবে না, কারণ তাহার পিছনে থাকিবে বিত্তহীন গণশ্রেণীর সংগঠিত শক্তি আর জাগ্রত জাতির অবিচল সংগ্রামশীলতা।" আমাদের অনেকেরই বয়স তখন উনিশ বিশ-এর মধ্যে। লেখা তখনও বেশ কাঁচা। তবু বোঝা যায় যে, 'অভিযান' কাগজ আমাদের লেখায় বাঁধুনি এনে দিচ্ছিল এবং রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গি তথা চেতনাকে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছিল। আমার ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতার বনিয়াদ এখানেই।

উনত্রিশ সাল গড়িয়ে ত্রিশে পড়ল। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এসসি. পড়ি। দেশের মধ্যে মানুষের মনের বারুদে মাঝে মাঝেই আগুন লাগছে। একদিন কি একটা হরতাল উপলক্ষে বুড়োদার স্বদেশী কারখানায় ছুটি। সকলে মিলে হরতাল দেখতে এগিয়েছি হেদো পর্যন্ত। কিন্তু পুলিশ কিছুতে দাঁড়াতে দেবে না। পুলিশের সঙ্গে তর্ক করছি, পুলিশ পা লক্ষ্য করে লাঠি চালাল। মাঝখানে লাফিয়ে পড়লেন বুড়োদা, আমার আঘাতটা তাঁর পায়েই লাগল সকলে মিলে বুড়োদাকে ধরে ধরে বাড়িতে ফেরালাম। তাঁকে আর সাতদিন বিছানা থেকে উঠতে হয় নি। তবে পুলিশের লাঠির কথা শুনে স্বদেশী কোম্পানি ছুটি দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে সরকারি গোলামখানা অর্থাৎ স্কুল কলেজ বয়কটের হাওয়া উঠেছে। আমাদের কলেজ গেটে পিকেটিং। কলেজ ছাড়ার প্রোগ্রামে আমাদের বিশেষ সায় ছিল না। তাহলেও সহপাঠিদের সঙ্গে তো বিরোধ করা যায় না। তাই কলেজ যাওয়া বন্ধ করলাম। এবং পিকেটিং করা সহপাঠীরা যখন আবার কলেজে ফিরে গেলেন তখনও আর ফিরতে পারলাম না। একবার যখন বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে এসেছি তখন আর কোন লজ্জায় ফিরে যাই?

বেশি দিন বেকার থাকতে হয় নি। বুড়োদা যে নামকরা স্বদেশী কারখানায় কেমিস্টের কাজ করতেন আমিও তার কাছাকাছি আর একটা ছোট কারখানায় কেমিস্টের কাজ পেয়ে গেলাম। ছুটির সময় প্রায় রোজই ফিরতাম একসঙ্গে, আর বাড়ি এসে কোনো রকম জলখাবার সেরে নিয়ে ছুটতাম বুড়োদাদের বাড়িতে। কারণ সেখানেই আমাদের আড্ডা এবং 'অভিযান'-এর দপ্তর।

একদিন বুড়োদাদের বাড়ি পৌঁছে দেখি বুড়োদা সবে কারখানা থেকে ফিরে জামা খুলছেন, মানে ওভারটাইম খেটে এসেছেন। কী রকম একটা অদ্ভুত গন্ধ আসছিল বুড়োদার জামা থেকে। জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন—বল দেখি কিসের গন্ধ?

একটু ভেবে বললাম—মনে হচ্ছে যেন জুতোর কালির গন্ধ।

ঠিক বলেছিস, বললেন বুড়োদা। 'নাইট্রো-বেনজিন' দিয়ে জুতোর কালিতে গন্ধ করে—খুব শস্তা সুগন্ধি নাইট্রো-বেনজিন। আমাদের কারখানায় প্রচুর নাইট্রো-বেনজিনের অর্ডার এসেছে।

কেন, বাজারের আমদানি-করা নাইট্রো-বেনজিন কি হল?

বাজারে এখন নাইট্রো-বেনজিন নেই, বললেন বুড়োদা। অথচ স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় দেশী জুতোর কালির প্রচণ্ড চাহিদা। তাই বড় বড় অর্ডার পাচ্ছি নাইট্রো-বেনজিনের। তৈরি করার ভার পড়েছে আমারই ওপর।

কিন্তু বেশি পরিমাণে নাইট্রো-বেনজিন করার মতো 'স্টিল' আর অন্য সব আসবারপত্র আছে তো?

না। কোথায় পাব? ল্যাবরেটরির ফ্লাস্কেই কোনো রকমে করে যাচ্ছি। সেজন্যেই তো এত ওভারটাইম খাটা।

স্বদেশী জুতো

আমরা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। নাইট্রো-বেনজিন এক ধরনের বিষ—ধীর গতিতে শরীরের ওপর ক্রিয়া করে। বুড়োদাকে সবাই বললাম, সাবধানে কাজ কোরো। কোম্পানির কাছে উপযুক্ত এপারেটাস দাবি করো।

বুড়োদা দাবি করেছিলেন, তাঁর হয়ে সহকর্মীরাও কেউ কেউ দাবি করেছিল। কিন্তু কোম্পানি শোনে নি। ম্যানেজার হেসে বলেছিলেন—নাইট্রো-বেনজিন আবার বিষ, মশা আবার পাখি! স্বদেশী জুতোর কালির

জন্যে স্বদেশী কারখানার কেমিস্ট বুড়োদা হপ্তার পর হপ্তা ধরে দিনরাত বিষের ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করে গেলেন। না করলে চলবে কি করে, নতুন স্বদেশী মাল দিয়ে বিদেশী নাইট্রো-বেনজিনের বাজার দখল করার সুযোগ এসেছে যে!

একদিন সন্ধ্যায় একটু দেরিতেই বুড়োদাদের বাড়িতে পৌঁছেছি, দেখি—বুড়োদার সাইকেলখানা নিচেই পড়ে. অন্যদিনের মতো দোতালায় তোলা নেই। ঘরে গিয়ে তাঁর চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। মুখটা হলদে হয়ে গেছে, অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছেন।

তখনই সবাই মিলে নিয়ে গেলাম আর. জি. কর হাসপাতালে। কিন্তু বৃথা। দিনের পর দিন ধরে নাইট্রো-বেনজিনের বিষক্রিয়ার ফলে সেদিন মধ্যরাত্রেই তাঁর মৃত্যু হল।

মৃতদেহ পাহারা দেবার জন্যে হাসপাতালের এক অন্ধকার কোণে রাত জেগে বসেছিলাম আমি আর আর-এক বন্ধু। একটা কথাও বলিনি দুজনে। কিন্তু মনের মধ্যে তখন রক্ত ঝরছিল। ভাবছিলাম—সেই মাদাম দেফার্জের কথা। আর একটি গ্রন্থির শক্ত বন্ধনে তোমার মৃত্যু বাঁধা রইল বুড়োদা। একদিন এর কৈফিয়ত আদায় করব।

রুণুবান্ধব

১৩ সেপ্টেম্বরের কালান্তরে পড়লাম যে, দীর্ঘ দিনের কমিউনিস্ট, বেলেঘাটার রণবীর ঘোষ তাঁর আজীবন সঞ্চিত ২৫০টির ওপর দুষ্প্রাপ্য মার্কসবাদী পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা লেনিন স্কুলে দান করেছেন। 'এই সঞ্চয়ই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুঁজি' বলে মন্তব্য করেছেন কালান্তরের রিপোর্টার।

খবরটা পড়ে দূর অতীতের কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি চকিতে মনের মধ্যে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্নও জাগল—কখানা বই-ই কি বেচারা রণবীরের দীর্ঘ রাজনৈতিক সাধনার প্রধান পরিচয়? যে আবেগ, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি যে ভালবাসা, আর যে বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তাকে অপ্রচলিত পথে পা বাড়াতে সাহস দিয়েছিল এবং কঠোর পরিশ্রমের রাজনৈতিক সাধনায় টেনে রাখতে পেরেছিল তার মূল্য কি এমন কিছু নয়?

আগের কথা

রাজনৈতিক কর্মী রূপে ঘনিষ্ঠভাবে রণবীরকে দেখেছি ১৯৩৫ সালে। কিন্তু তার আগেও নিশ্চয়ই আরো খানিকটা ইতিহাস আছে। রণবীর আসলে ঢাকার ছেলে। ১৫-১৬ বছর বয়সে স্কুলে পড়ার সময়ই কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন তাকে আকৃষ্ট করে। ১৯৩০ সালে ঢাকা থেকে চলে আসে কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিতে, পুলিশের লাঠিতে আহত হয়ে স্থান পায় হাসপাতালে। পরে ঢাকা ফিরে গিয়ে ১৯৩১ সালের ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে দণ্ডিত হয়। পড়াশোনায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল—জেল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাস করে।

এই জেলজীবনের আলাপ-আলোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার ভিতর দিয়েই তার রাজনৈতিক ধারনায় পরিবর্তনের সূত্রপাত। আন্দোলন প্রত্যাহার করে গান্ধীজী যখন আরউইনের সঙ্গে চুক্তি করলেন তখনই অন্য অনেক তরুণ মনের মতো রণবীরের মনেও জিজ্ঞাসা দেখা দিল—পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে আপসহীন সংগ্রামের বদলে অহিংসার অজুহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে রফা করে আংশিক ক্ষমতা পাওয়াই কি কংগ্রেস আন্দোলনের পরিণতি ?

জিজ্ঞাসা থেকে শুরু হল নতুন পথের সন্ধান। জেল থেকে বেরিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের আশায় সে অনুশীলন সমিতির একটি ছোট উপদলে যোগ দেয় বটে কিন্তু সেখানেই সে প্রথম রুশ বিপ্লব, কমিউনিজম ইত্যাদি কথা জানতে পারে, লেনিনের 'স্টেট অ্যাণ্ড রেভলিউশানে'র বাঙলা অনুবাদ, এঙ্গেলসের পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' ইত্যাদি বইও পড়ে ফেলে। খুব যে বুঝেছিল তা হয়ত নয়। তবে মনের মধ্যে যে ধারণাটা সবচেয়ে দাগ কেটেছিল তা হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা। শিল্প অঞ্চলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আর কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগস্থাপন করার উদ্দেশ্যে তাদের গ্রুপ থেকে কেউ গেল বোম্বাইয়ে, কেউ গেল বর্মায়, আর রণবীর চলে এল কলকাতায় (১৯৩৪)।

ঢাকা থেকে কলকাতায়

কলকাতায় এবং আশেপাশে বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট গ্রুপটি তখন কলকাতা কমিটি নামে মোটের ওপর সুসংগঠিত হয়ে উঠছে। আমাদের সে সময়ের মুখপত্র ছিল মার্কসপন্থী—সম্পাদক আব্দুল হালিম। রাস্তার হকার্স স্টলে মার্কসপন্থী পড়ে রণবীরের ভাল লাগল। কয়েক মাস পরে

একদিন সোজা গিয়ে হাজির হল সম্পাদক আব্দুল হালিমের কাছে। শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী, এই শিক্ষা থেকে শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে খুবই আগ্রহ ছিল রণবীরের। তাই সে সোজাসুজি শ্রমিক এলাকায় কাজ করবার ইচ্ছা জানাল। মেটেবুরুজ অঞ্চলে আমাদের যে তরুণ শ্রমিক সংঘ (Young Workers' League) গড়ে উঠছিল, সেখানেই তার হাতে খড়ি।

এসময় অবশ্য রণবীরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। কারণ আমি তখন আলিপুর জেলে বন্দী। বন্দী হওয়ার আগে আমাকে অনেকখানি সময় দিতে হত মেটেবুরুজে শ্রমিক আন্দোলন তথা পার্টি গড়ার কাজে। ত্রিশের দশকের প্রথম ভাগে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও মুনাফা অটুট রাখার জন্যে মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের ওপর ছাঁটাই, বেতন হ্রাস ইত্যাদির যে নিষ্ঠুর আক্রমণ শুরু করেছিল তা তখনো চলছে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও তখন নেই বললেই হয়। তবুও প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট ইত্যাদির মারফৎ শ্রমিকরা অনেক কারখানায়-ই আত্মরক্ষার লড়াই লড়ছে, কিন্তু বেশির-ভাগ ক্ষেত্রে হারতে বাধ্য হচ্ছে। ওখানকার সুতাকল, হোসিয়ারি, চটকল ইত্যাদিতে স্ট্রাইক হল, কিন্তু মালিকদের আক্রমণ ঠেকানো গেল না, নতুন করে আরো কিছু নেতৃস্থানীয় শ্রমিক স্ট্রাইক পরিচালনার অজুহাতে ছাঁটাই হল। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে তখন আন্দোলন সম্বন্ধে হতাশা, এমন কি আতঙ্কের আবহাওয়া।

প্রকাশ্য আন্দোলন যখন কঠিন

শ্রমিকদের প্রকাশ্য আন্দোলনে টেনে আনা যখন কঠিন তখন ব্যক্তিগতভাবে দু'চার জন শ্রমিককে, বিশেষ করে তরুণ শ্রমিককে, প্রধানত সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মের আড়ালে সমাবেশ করার জন্যে ইয়ং ওয়ার্কার্স লীগের জন্ম। তাছাড়া আমাদের তখনকার দিনের পার্টি আকারে খুব ছোট হলেও তার একটা সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ছিল বাস্তবে শ্রমিকশ্রেণীর ভেতর থেকেই যথাসম্ভব পার্টির ক্যাডার সংগ্রহ করা এবং পার্টির নেতা তৈরি করা। তখনকার কলকাতা কমিটিতে পরিচালকের সংখ্যা বোধ হয় ৭।৮ জনের বেশি হবে না, কিন্তু তার মধ্যেই দু'জন ছিলেন কর্মরত শ্রমিক—একজন রাজাবাগান কার-খানার, আরেকজন বি-এন রেলের। রাজাবাগানের শ্রমিক কমরেডটি আবার পার্টি কমিটির সম্পাদকও ছিলেন।

আমি জেলে যাওয়ার আগে শেষ যে ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তা ছিল

মেটেবুরুজের ক্যালকাটা ম্যাচ ওয়ার্কস নামে দেশলাই কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট। কারখানার মালিকরা জাপানী। কিন্তু মালিক জাপানী হলেও তাদেরই মুনাফা রক্ষার জন্য সারা অঞ্চলে ব্রিটিশের পুলিশ আর গোয়েন্দা গিস্‌গিস্ করত। পুলিশের লাঠি চলল নিরস্ত্র শ্রমিকদের মাথার ওপরে—এমন কি কমরেড রণেন সেনও দু'চার গুঁতো থেকে রেহাই পান নি।

অসম সংগ্রামে পরাজিত হয়ে অনেক ছাঁটাই মেনে নিয়েই শ্রমিকদের শেষপর্যন্ত কাজে ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু তারপরও কারখানা গেটে সর্বদা পুলিশ মোতায়েন থাকত, টিকটিকি ছড়িয়ে থাকত শ্রমিক অঞ্চলে। আতঙ্ক ছেয়ে গিয়েছিল শ্রমিকদের মধ্যে। প্রকাশ্যে আন্দোলন করতে বা বাইরের নেতাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে তারা তখন ভয় পেত।

সাধারণভাবে শ্রমিক আন্দোলনের যখন এই অবস্থা তখন আমাকে (এবং আরও কিছু কমরেডকে) গ্রেপ্তার হয়ে জেলে ঢুকতে হয়। রণবীর তখনো মেটেবুরুজ পৌঁছায় নি।

মেটেবুরুজে

১৯৩৫-এর গোড়ার দিকে জেলখাটার মেয়াদ শেষ করে প্রধান আস্তানা গাড়লাম মেটেবুরুজের মজুর এলাকায়। কলকাতায় গোয়েন্দা পুলিশ যে রকম দিন রাত প্রায় তাড়া করে চলত, তার জন্যে এবার শহরের এই উপকণ্ঠে মজুরদের মধ্যে একটু গা-ঢাকা দিয়েই থাকার ব্যবস্থা হল।

সেই সূত্রে রণবীরের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা, কারণ ও ততদিনে মেটেবুরুজে এসে ইয়ং ওয়ার্কার্স' লীগের কাজ করছে, এবং ও যেখানে থাকত সেখানেই তুলে দিয়েছে আমাকে।

অবিশ্যি ওর নাম যে রণবীর তা তখন জানতাম না। পার্টির নির্দেশ মতো সেও তখন আধা-আণ্ডারগ্রাউণ্ড, সুতরাং সত্যি নাম বলা নিষেধ, জিগ্যেস করলে ছদ্মনাম বলতে হবে। ওর ডাকনাম ছিল রুণু। সেই ডাকনামের সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে আধা-আণ্ডারগ্রাউণ্ডের মতোই সে নিজের এক অপূর্ব আধা-ছদ্মনাম জাহির করল—রুণুবান্ধব। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ঐ নামেই তাকে জানতাম।

রুণুর বাড়ির অবস্থা মন্দ ছিল না। ঢাকা শহরে একখানা বাড়ি ছিল, মা ছাড়া আর কোনো পোষ্য ছিল না, ম্যাট্রিক পাস করায় সুযোগ ছিল চাকরিরও। তার আগেকার দলে থাকলে রাজনীতি করাও চলত, আবার

মধ্যবিত্তসুলভ জীবনের স্বচ্ছন্দ্যও ভোগ করা চলত। তা সত্ত্বেও নোংরা বস্তি অঞ্চলের দীনহীন জীবনের মধ্যেই সে তার দিনযাপন আর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রটিকে বেছে নিয়েছিল এটাই তার বিপ্লবী সততা আর আদর্শ-নিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য। আজকের রণবীর ঘোষ বহু আঘাতে জীর্ণ, বিষণ্ণ—কিন্তু সেদিনের রুণু ছিল হাসিখুশি, দিলখোলা, সরল—সকলের সঙ্গে অবাধে মিশতে পারে—মাঝে মাঝেই জোরে গান গেয়ে ওঠে "খোল খোল দ্বার, রাখিও না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে"—আবার দুরন্ত পরিশ্রমেও কখনো পিছপা হয় না। এইসব গুণের জন্যেই সে তখন ইয়ং ওয়ার্কার্স লীগের সবকটি তরুণ শ্রমিকেরই মন জয় করে ফেলেছিল, একবাক্যে নির্বাচিত হয়েছিল তাদের সম্পাদক।

আগ্নিপরীক্ষা

আমি জেলে যাওয়ার প্রায় মুখে মুখেই (জুলাই ১৯৩৪) ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং আরও অনেক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এক নতুন আক্রমণের লাঠি উঁচিয়েছিল। তাই জেল থেকে বেরিয়ে মেটেবুরুজে এসে মনে হল আন্দোলনের অবস্থা আগের চেয়েও সন্ত্রস্ত। সেই আগেকার দেশলাই কলের শ্রমিকরা কাছেই আসতে চায় না, কথা বলা তো দূরস্থান। এমনি আরও অনেক জায়গায়।

তখন দেশলাই কারখানায় কিছু লোক ভর্তি করছে। দেখে আমাদের মাথায় একটা মতলব এল—পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে তবে মহম্মদই পর্বতের কাছে যাক না কেন? অর্থাৎ রুণুর মতো কাউকে কারখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া যাক—শ্রমিক হিসাবেই সে শ্রমিকদের বুঝবার এবং টানবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু সে যাবে কি? সে পারবে কি? আজ থেকে সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার দিনে ভদ্রলোকশ্রেণীর কোন ছেলের পক্ষে—বিশেষ করে সে যদি একেবারে নিঃস্ব বা নিরক্ষর না হয়—কারখানায় গিয়ে কুলিমজুরের সঙ্গে কুলিমজুরের মতো হাড়ভাঙা মেহনত করা শারীরিক ও মানসিক দু'দিক থেকেই একটা অভাবনীয় ব্যাপার।

রুণুকে বলতেই সে কিন্তু একপায়ে খাড়া। বলল, এতো দারুণ সুযোগ। বস্তিতে মজুরের দুঃখ-দারিদ্র্য দেখেছি বটে কিন্তু কারখানার মেহনতের জীবনে কখনও তো ভাগ নিই নি। তাদের সঙ্গে তাদের মতো মজুরির

জাঁতায় পিষে না এলে মজুরশ্রেণীর অনুভূতি বুঝব কি করে, মজুরদের সঙ্গে সত্যি সত্যি একাত্মই বা হব কি করে?

তার কথাটা খুবই সত্যি। তবে কারখানার মজুরের সঙ্গে মজুরি করে মেহনতের যন্ত্রণার বাস্তব অনুভূতি ছাড়াও আরো কিছু ফল আছে.সে কথাও তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কারখানার মালিক তার নিজের প্রয়োজনেই দূর-দূরান্ত থেকে ভূমিহারা কৃষক, খেতমজুর, গ্রাম্য কারিগর, এমন কি আধা-ভদ্র সন্তান পর্যন্ত অনেক মানুষকে এক জায়গায় জড়ো করতে বাধ্য হচ্ছে, বাধ্য হচ্ছে তাদেরকে যান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে, এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগের 'কনভেয়ার বেল্টের' গমনাগমনের সঙ্গে তাল রেখে কাজ করতে করতে শ্রমিকরা ঐকতানের এক মহাশিক্ষা লাভ করছে—মালিকের ইচ্ছা না থাকলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই সে শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে। আর সেই জন্যেই গ্রামের কৃষক বা কারিগর কিম্বা রোমান্টিক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর তুলনায় শ্রমিকশ্রেণী অনেক সহজেই বিপ্লবী শিক্ষার বাস্তবতা আয়ত্ত করতে পারছে।

রুণু কিছুটা বুঝেছিল, পরবর্তী দিনগুলোতে হাড়ভাঙা মেহনতকে তার মধ্যবিত্ত জীবনের শিক্ষাদীক্ষার আলোর সঙ্গে যুক্ত করে হয়ত বোধটা দিনে দিনে আরো স্বচ্ছ করে তুলেছিল। পেটিবুর্জোয়া-সুলভ অভিমান তার মোটেই ছিল না, প্রাণচঞ্চল উচ্ছলতায় সহজে সকলের সঙ্গে মিশতে পারত সে কথা আগেই বলেছি। সেই গুণেই শ্রমিকদের মধ্যে অনেককেই সে বন্ধু করে ফেলল কয়েক মাসের মধ্যেই।

ধূমপান সমিতি

এতদিনে তার বাস্তববোধও বেড়েছিল। তাই বুঝতে পারল যে, ইউনিয়নের কথা বললে শ্রমিকরা এখনো এগুতে সাহস পাবে না। তখন সে এক ফন্দি বার করল। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একটা সমিতি গঠন করল। তার নাম 'ধূমপান সমিতি।' কারখানা থেকে কিছু দূরে একটা ঘরও ভাড়া নিল সমিতির জন্য। পয়সা উঠল সকলের চাঁদায়। ছুটি পেলেই শ্রমিকরা অনেকেই ওখানে জমা হত প্রধানত আড্ডা মারা, চা পান, ধূমপান ইত্যাদির জন্যে। আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে কখনো কোন খবরের কাগজ থেকে বাছাই করা খবর পড়ে শোনাত রুণুবান্ধব, কিংবা একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হলে পার্টির

কাগজপত্রও পড়ে শোনাত। গল্প বলত রুশ বিপ্লবের, ফরাসী বিপ্লবের আর ভারতের ওপর ব্রিটিশ জবর দখলের—এমনি অনেক কিছু।

এইভাবে তার কাজ যখন বেশ অনেক দূর এগিয়েছে, উচ্চতর সংগঠনের জমি প্রায় তৈরি হয়েছে, ঠিক সেই সময় আমাকে চলে যেতে হল পার্টির কাজে বোম্বাইয়ে—সেখানে সর্বভারতীয় পার্টি কেন্দ্রের ভার তখন আমার ওপর ন্যস্ত। কাজেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল রুণুর সঙ্গে। সে ছাড়াছাড়ি রইল বহুদিন, কারণ বোম্বাইয়ে কাজ করতে করতে গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম '৩৬ সালে, জেল খাটলাম দু'বছর—রুণু কেন, কলকাতার কোন খবরই তখন আর আমার কাছে পৌঁছাত না। তবে ভিন প্রদেশের জেলে নিঃসঙ্গ কারা জীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে এদের কথা মনে পড়ত, ভাবতাম যখন কলকাতায় ফিরব তখন হয়ত দেখব রুণু এক খাঁটি শ্রমিকে পরিণত হয়ে শ্রমিকদের পরিচালনা করছে, তদানীন্তন শিথিলতর দমননীতির সুযোগ নিয়ে হয়ত মস্ত বড় শ্রমিক সংগঠনই গড়ে তুলেছে।

জেলের মেয়াদ শেষ করে কলকাতায় ফিরেছিলাম ১৯৩৮-এর গোড়ার দিকে। কিন্তু রুণুকে দেখি নি।

এই দু আড়াই বছরে রুণুর কাজ কেমন এগিয়েছে, সে এখন কোথায় জিজ্ঞাসা করতে কমরেডরা বললেন, রুণু সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য ঢাকায় গেছে বটে, তবে সে এখন পার্টি 'অ্যাপারেটাসের' মস্ত বড় কর্মী।

কথাটার মানে ঠিক বুঝলাম না। শুধালাম, দেশলাই কারখানায় সে কাজ করে না?

"সে তো সামান্য কাজ"—বললেন কমরেডরা। "আপনি বোম্বাইতে ধরা পড়ার পর পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর বোম্বাই থেকে তুলে এনে স্থাপন করা হয়েছিল কলকাতায়। সেই গোপন পার্টির গোপন প্রাণকেন্দ্র, যেখানে স্বয়ং জেনারেল সেক্রেটারির অবস্থান, সেখানে কাজ করার সম্মান পেয়েছিল রুণু।"

আরো বিশদ ব্যাখ্যা করে তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন যে, পার্টি কেন্দ্রে বিশ্বস্ত টাইপিস্টের দরকার ছিল। তাই রুণুকে দেশলাই কারখানার সামান্য কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনে টাইপ স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল এবং তারপর তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় পার্টি অ্যাপারেটাসের টাইপিস্ট পদে।

দু'বছর ধরে সে ঝড়ের মতো blind-fold typing-ই করে গেছে। প্রকৃতই শ্রেণীচ্যুত এক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী যে উৎপাদনী মেহনতের অগ্নিশুদ্ধতে

নিজেকে প্রায় খাঁটি শ্রমিকে পরিণত করেছিল, সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল দু' বছর ধরে। একটি বিপ্লবী শ্রমিকের বিনিময়ে আমরা একটি বিশ্বস্ত টাইপিস্ট পেয়েছিলাম।

সে অন্ধতা তার, না আমাদের ?*

সভ্য হবার আগে

স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর আশা ও আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই আন্দোলনকে প্রতারিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার যখন ১৯২৮ সালে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নামে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক ষোলআনা সাম্রাজ্যবাদী কমিশন—যার সকল সভ্যই বিলাতি গোরা—ভারতে পাঠাল, তখন ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা সে প্রতারণাকে খান খান করে ভেঙে ফেলল। সাইমনবিরোধী বিক্ষোভে উদ্বেল হয়ে উঠল সারা দেশ। বিক্ষোভ দমনের চেষ্টায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও আবার উলঙ্গ অত্যাচারের পন্থা গ্রহণ করতে হল। লালা লাজপত রায়ের মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতাকেও তারা আঘাতে আঘাতে এমন জর্জরিত করেছিল, যার পরিণামে তাঁর মৃত্যুর দিন এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু এই অত্যাচারে আরও পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল দেশবাসীর ঘৃণা ও ক্রোধ।

দুর্ভাগ্যক্রমে, জাতীয় কংগ্রেসের সর্বশক্তিমান নেতা গান্ধীজী এবং তথাকথিত সর্বদলীয় কমিটির কিছু নরমপন্থী নেতা ভারতীয়দের সেই যন্ত্রণাময় অনুভূতিতে সাড়া দিতে পারেন নি। সর্বদলীয় কমিটি তাঁদের রিপোর্টে ভারতের জন্য স্বাধীনতা দাবি করেন নি, চেয়েছিলেন শুধু ডোমিনিয়ন স্টেটাস। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষ-নেহরু প্রমুখ বামপন্থীদের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও গান্ধীজী প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন যে, কংগ্রেস সর্বদলীয় কমিটির খসড়া-সংবিধান অনুমোদন করছে এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৯-এর আগে ঐ খসড়া পুরোপুরি মেনে নেয় তাহলে কংগ্রেস সেই সংবিধান গ্রহণ করবে। তবে বামপন্থীদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এইটুকু যোগ করা হল যে, ঐ তারিখের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের

* রুগ্নবান্ধবের ইতিহাস এর পরেও আছে, সম্ভব হলে সে কথা আরেক দিন বলব।

সাড়া না পেলে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করবে, ট্যাক্স ইত্যাদি বন্ধ করার পরামর্শ দেবে।

কিন্তু ব্রিটিশ, ভবী ভুলিবার নয়। উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ জবাবও দিল না। বরং মানুষের প্রতিবাদকে অত্যাচারের যাঁতায় পিষে গুঁড়িয়ে দিতে চাইল। এদিকে আপসের ইচ্ছা মরেও মরে না। ১৯২৯-এর নভেম্বরে গান্ধী, নেহরু পিতা ও পুত্র, এ্যানি বেসান্ট, সাপ্রু ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে দিল্লী ইশতেহার বার করে মহামান্য সম্রাটের গভর্নমেন্টের কাছে সহযোগিতার প্রস্তাব দিলেন যাতে একটি ডোমিনিয়নভিত্তিক শাসনতন্ত্রের ছক তৈরি করা যায়।

কিন্তু ভবী এবারও ভুলিল না।

তবে মানুষও ভোলে নি। ক্ষমতাদৃপ্ত সাম্রাজ্যবাদের হাতে বার বার অপমান নেতাদের বুকে না বাজলেও সাধারণ মানুষ তথা সাধারণ কংগ্রেসকর্মী-দের বুকে বেজেছিল। সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের যন্ত্রণা তাদের রক্তে রক্তে রগরগিয়ে উঠেছিল। ১৯২৯-এর শেষে লাহোরে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল, তখন বিপুল জনধারায় স্বসমুখ চূড়ান্ত বাণী বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত হল—আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। এ সমুদ্রতরঙ্গ রোধ করার ক্ষমতা সেদিন কোনো নেতারই ছিল না। লাহোর কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের শিবিরে শিবিরে সেদিন কী জয়োল্লাস!

১৯২৯ সালে শেষ প্রহর কিংবা ১৯৩০-এর প্রথম প্রহর। লাহোরের সেই ঐতিহাসিক মধ্যরাত্রিতে শীতের প্রচণ্ডতায় সমস্ত কংগ্রেস-নগরীই যেন নীরব নিথর। কিন্তু প্রতিনিধিদের মনে উত্তাপ ছিল। সার্ধ-শতাব্দীব্যাপী শৃঙ্খলের দুঃসহ যন্ত্রণা ও অপমান তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়ে তখন অগ্নুৎপাতের মতো নির্গমনের পথ খুঁজছে। মধ্যরাত্রির শীতার্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে আকাশে উঠল স্বাধীনতার জয়গান। কোলাহল করতে করতে তাঁরা ছুটে গেলেন রাভি নদীর তীরে। হিমশীতল রাভি নদীর কিনারে কিনারে তুষারের আভাস। ক্ষিপ্ত মানুষের মনের তুষার সেদিন গলছে। ত্রিবর্ণরঞ্জিত স্বাধীনতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে তারা ঘোষণা করল—আমাদের দাবি পূর্ণ স্বাধীনতা। রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি—সকল দিক দিয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সকল সম্পর্কচ্ছেদ আমাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার।

লাহোর কংগ্রেস থেকে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য

অনুমতি দেওয়া হল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে। আর ২৬ জানুয়ারি সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস পালন করে পূর্ণ স্বাধনিতার ঘোষণা প্রচার করার জন্য নির্দেশ দিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি।

১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমি বা আমার বন্ধুবান্ধবরা তখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখিনে. কংগ্রেসেরও আমরা তখন সভ্য নই। তাহলেও পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প আমাদের মাতিয়ে তুলেছিল। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমরা কয়েকজন বন্ধু যখন হেদোর ধারে জমা হয়েছি, তখন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আমার গুরু 'বুড়ো-দা' বেশ জোর আঘাত পান—সে-কথা 'কালান্তর'-এর গত শারদীয় সংখ্যায় 'আমার গুরু' প্রবন্ধে আমি বর্ণনা করেছি। তারপর একটি প্রসিদ্ধ স্বদেশী রাসায়নিক কারখানায় কেমিস্টের কাজ করতে করতে স্বদেশী মালিকদের তাড়নায় কিভাবে তিনি উপযুক্ত নিরাপত্তা-ব্যবস্থা ছাড়াই নাইট্রোবেনজিন নামক বিষ তৈরি করতে বাধ্য হন, কিভাবে সেই বিষ ধীর-গতিতে শরীরের ওপর ক্রিয়া করে ক-দিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটায়, 'স্বদেশী' মুনাফার উদগ্র লালসা কিভাবে একটি আদর্শবাদী ও সম্ভাবনাময় জীবনকে অকালে বিনাশ করে—সে বিবরণও আমি গত শারদীয় সংখ্যায় লিখেছি।

এতদিন ধনবাদী শোষণ ও পীড়নের কথা জেনেছিলাম সমাজতন্ত্রের কেতাবে, কিংবা সংখ্যাতত্ত্বের সারণিতে। এবার তার বীভৎসতা অন্তরে অন্তরে অনুভব করলাম প্রিয় বন্ধু ও শিক্ষকের জীবনাহুতিতে। যে ধারণা ও অনুভূতি তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের সীমার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ছিল; ব্যক্তিগত যন্ত্রণায় সুতীব্র তীক্ষ্ণতা তাকে মূর্ত করে তুলে উপলব্ধিতে পূর্ণতা এনে দিল। এমনি-ভাবে ধনবাদ নিজেই তার কবর খোঁড়ার জন্য একজন নতুন সৈনিক সৃষ্টি করল।

আমাকে রাজনীতিই করতে হবে

আমি তখন আর-একটা কারখানায় কেমিস্টের কাজ করি। চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। খুব স্পষ্টভাবে না হলেও মনের ঝোঁকটা এ রকম দাঁড়াল যে, রাজনৈতিক জীবনই হবে আমার ভবিষ্যৎ জীবন আর ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হবে সে জীবনের লক্ষ্য।

তখন লবণ সত্যাগ্রহ ইত্যাদি চলছিল। কিন্তু সে-আন্দোলনের চৌহদ্দি

এত সংকীর্ণ ও শর্তকণ্টকিত যে, তা আমার মনকে টানল না। অনেক মানুষের মধ্যে একটা স্পন্দন জাগানোর দিক থেকে সে-আন্দোলনের সার্থকতা ছিল বটে, কিন্তু কেন যেন তাতে মন ভরল না। সর্বপ্রথম মনে হল—আমার কথা, আমাদের কথা, যন্ত্রণার অনুভূতি সব বলতে হবে, চিৎকার করে বলতে হবে। এর আগে হাতে লেখা 'অভিযান' কাগজ বার করে কিছুটা লেখার অভ্যাস হয়েছিল, যদিও তা স্বভাবতই পারিবারিক ও বন্ধুবান্ধব মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। এবার সবাই মিলে বার করলাম ছাপার হরফে সাপ্তাহিক 'অভিযান' কাগজ। মোটা মোটা কেমিস্ট্রির বই, কারও পরীক্ষার সোনার মেডেল, কারও হাতের আংটি বিক্রি করে আর বড়দের কাছ থেকে কিছু চাঁদা আদায় করে সংগ্রহ হল পুঁজি। লেখক সেই আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের স্বল্পপরিসর পুরানো গোষ্ঠী।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বাইরের রাজনীতিবিদদের মধ্যে এক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকেই অল্পস্বল্প চিনি। তাঁকে গিয়ে ধরলাম আমাদের কাগজে লিখতে হবে।

ডঃ দত্ত এক অদ্ভুত মানুষ ও আজীবন বিপ্লবী, তার ওপর জার্মান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রি, আবার মস্কো গিয়ে লেনিনের সঙ্গেও আলোচনা করে এসেছেন। শ্রমিক-আন্দোলনের অক্লান্ত কর্মী, তাছাড়া তখনকার বাঙলাদেশে যুব আন্দোলন সংগঠনে তাঁর ছিল প্রধান ভূমিকা। কংগ্রেস ও টেররিস্ট আন্দোলনের আশাহত কর্মী তথা রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়—যাদের মধ্য থেকেই তৈরি হবে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রথম বার্তাবহের দল—তাদের ভেতর ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যাপারে ডঃ দত্তের (ও তাঁর শিষ্য বঙ্কিম মুখার্জি) অবদান মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, সৌমেন ঠাকুর প্রভৃতি পরিচালিত 'গণবাণী' গোষ্ঠীর চাইতে কম তো নয়ই, বরং বেশিই হবে হয়ত।

সুদূর অতীতের স্মৃতিপটে অনেক ছবিই এখন ম্লান, অস্পষ্ট। তবু কেমন যেন আবছা ধারণা রয়ে গেছে যে, ডঃ দত্তের মনে একটা অভিমান ছিল: যারা কমিউনিস্ট হতে চায় তারা গিয়ে মুজফ্‌ফরদের সঙ্গে ভেড়ে, তাঁর কাছে আসে না, আর যারা তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় যুব আন্দোলনে জমা হয়, তারাই আবার সুভাষচন্দ্রের নাম শোনামাত্র জয়জয়কার করে ওঠে—যাকে তিনি ব্যঙ্গ করে নাম দিয়েছিলেন 'হুকা হুয়া'।

বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভূমিতে তখন তাঁর দুই অনুজ ভূপেন্দ্র ও মহেন্দ্রর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সদর দরজার ডান-পাশে এক নম্বর একটি ছোট বৈঠকখানায় রামকৃষ্ণ-ভক্ত ও বিবেকানন্দ-অনুগামী গৈরিকবেশী মহেন্দ্রবাবুর আড্ডা। শিষ্য ও অনুরাগীরা কেউ তামাক সাজছেন, কেউ কথামৃত আলোচনা করছেন। আর দরজার বাঁ-পাশে দু-নম্বর বৈঠকখানা-ঘরে প্রকাণ্ড দুর্গন্ধময় চুরুট হাতে ঘোর নাস্তিক ডঃ দত্ত—অনেক তরুণের সমাবেশ—নৃতত্ত্ব, বিপ্লব-তত্ত্ব, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে সরব আলোচনা আর তার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি কটাক্ষপাত।

আমাকে অবশ্য চিনতেন। কাগজের কথা বলতেই হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন তোমাদের পেটে কি মুজফ্‌ফরের 'জ্যোতি' না তোমরা 'হুক্কা হুয়া'র দলে? তারপর পিঠ চাপড়ে বললেন—খুব ভালো কাজ করেছ, ওয়ার্কারদের জন্য এখন আর-কোনো কাগজ নেই, তোমরা চালিয়ে যাও। একবার কেন, প্রতি সংখ্যায় লেখা দেব।

যতদিন সাপ্তাহিক 'অভিযান' জীবিত ছিল ততদিন তাঁর কথার খেলাপ হয়নি।

হতুকি বাগান লেনে 'গোলাপ প্রেস' নামে একটি ছোট্ট প্রেসে মান্ধাতার আমলের হ্যাণ্ড মেশিনে 'অভিযান' ছাপা হত। সম্পাদক ছিলাম আমি।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম বাঙলা মুখপত্র

'অভিযান'-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে যে কৈফিয়ত দিয়েছিলাম তার কিছু কিছু এখনো মনে আছে ('অভিযান'-এর কোনো সংখ্যা এখন আর কোথাও খুঁজে পাইনি)। কাব্যিক উচ্ছ্বাস, স্বল্পপক্ক মার্কসবাদ আর স্পর্ধিত আবেগ তার বৈশিষ্ট্য। লিখেছিলাম :

"আকাশের বুক চিরে এলো আলো, এলো সোনালী রৌদ্র। তার আগমনের কারণ নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। তেমনই আমরাও। আমরা এসেছি এই আমাদের আসার কারণ। ভেতর থেকে প্রয়োজনের তাগিদ জমা হয়ে না উঠলে মানুষ-সমাজের জীবনে কোন ঘটনাই ঘটে না—এই আমাদের বিশ্বাস।"

স্বাধীনতা ও শ্রমিক-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা ও সংবাদ যদিও এই কাগজের প্রধান অংশ জুড়ে থাকত, তাহলেও জগদীশ গুপ্ত-ঢঙের ছোটোগল্প

এবং তারুণ্যের প্রত্যয়সিদ্ধ কবিতা তাতে বৈচিত্র্য এনে দিত। একটি কবিতার খানিকটা নমুনা দিই :

"আমি চাই পূর্ণ করি বাঁচিবার সেই অনুভব,
যে জীবন প্রতিক্ষণে
মর্ম মাঝে নৃত্য ছন্দে দুলে দুলে ওঠে,
পাষাণ-প্রাচীর ভাঙ্গে বন্দীর
বন্দনা গানে,
গুঞ্জরিয়া, মর্মরিয়া তোলে কোন
সুসুপ্ত কাননে
মাগি আমি, মাগি সেই স্বপ্ন জাগরণ—
মরিয়াও বেঁচে থাকে যে তুচ্ছ জীবন।"

এই কবিতা লিখেছিল 'বুড়ো দা'-র ছোটো ভাই আদি (ভূতপূর্ব কমিউনিস্ট কাউন্সিলার ডঃ অমর ভাদুড়ীর বাবা)। সে ছিল আমাদের কাগজের পরিচালক।

গোলাপ প্রেসের মালিক মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে আমরা 'বড়দা' ডাকতাম। যদিও রাজনীতির ধার ধারতেন না, তাহলেও সাহিত্যোৎসাহী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। কবি প্রণব রায় (সম্প্রতি মারা গেছেন), 'বসুমতী'-র সহ-সম্পাদক ও ঔপন্যাসিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পরবর্তীকালে 'মিশনারী' কাগজের সম্পাদক সুনীল ধর প্রমুখ কয়েকজন উদীয়মান সাহিত্যিককে ঘিরে 'বড়দা'-র মজলিশ আগে থেকেই চালু ছিল। এঁরা আবার সকলেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার প্রচণ্ড ভক্ত। সেই মজলিশে আমরাও স্থান পেলাম। দু-একবার অচিন্ত্য সেনগুপ্তকেও সেখানে আসতে দেখেছি। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে একখানা গোটা উপন্যাসের জন্য দুশো টাকা পেয়ে কি রকম আনন্দবোধ করছিলেন, তা শুনেছি—তখনকার দিনে উদীয়মান লেখকের পক্ষে দুশো টাকা বড় কম নয়। তাঁর বইয়ের শেষ পর্যন্ত পাঠকের আগ্রহকে তিনি কিভাবে টেনে নিয়ে যেতে পারেন, সে সাফল্যের কৌশলও তিনি একদিন বলেছিলেন : আমি নায়ক-নায়িকাকে 'এই করল' 'এই করল' বলে ঝুলিয়ে রাখি। 'করা'টা একেবারে শেষে।

প্রণব রায়ের কবিতার মধ্যে আমার মতে সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। তাছাড়া তাঁর লেখায় রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক আবেগও ছিল। আর্থিক

দুর্দশার চাপে সিনেমার সস্তা গান লিখতে বাধ্য না হলে হয়তো তিনি সময়-কালে প্রথমশ্রেণীর কবিদের মধ্যে স্থান পেতেন। যাই হোক, তাঁর একটা কবিতার চারটে লাইন নিয়ে আমাদের একবার বেশ মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন :

শ্বেতদ্বীপ পার হয়ে এল আজ বণিক রাবণ
অন্ধকার রাত,
তোমার সীতারে দস্যু করিছে হরণ
তোলো শীর্ণ হাত।

মেক-আপ প্রুফ পড়ে 'বড়দা' তো মহাখাপ্পা—'আপনারা কি আমাকে জেলে পাঠাতে চান? সব ভেঙে ফেল, ছাপা হবে না।' কে যেন বুদ্ধি করে 'শ্বেতদ্বীপ পার হয়ে'র বদলে বসিয়ে দিল 'বাণিজ্য সম্ভার লয়ে'। তখনকার মতো ফাঁড়া কাটল।

'আত্মশক্তি' কাগজের ভূতপূর্ব লেখক প্রয়াত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নিয়মিত লেখা দিতেন—ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে। 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' লিখে প্রগতিশীল হিসেবে শিবরাম চক্রবর্তীর যুবমহলে তখন বেশ নাম। তাছাড়া তাঁর 'মানুষ' ও 'চুম্বন' কবিতা-গ্রন্থ দুটিরও আমরা ভক্ত ছিলাম। তাঁকে গিয়েও লেখার জন্য ধরি। দু-তিন দিন তিনি অনর্গল ঘণ্টা দুই ধরে গল্প করে গেলেন, কিন্তু লেখা দিলেন না এক লাইনও। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'তারুণ্য'তে এক ধরনের দুঃসাহসিক ব্যক্তিকতা ছিল, যা তখনকার দিনে বিরল। তাঁকেও আমরা লেখা দেওয়ার জন্য চিঠি লিখেছিলাম। তিনি লেখা দেন নি, তবে যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে বোঝা যায় যে; কাগজখানা অন্তত পড়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তিনি লিখেছিলেন : ভেতর থেকে প্রয়োজনের তাগিদ জমা হয়ে উঠেই আপনাদের জন্ম; তা তো আপনারা ঘোষণা করেছেনই। সেই ভেতরের তাগিদ আপনাদের আরো এগিয়ে নিয়ে যাক। আমাদের মতো বাইরের লোকের সাহায্য দরকার হবে না।

শ্রমিকদের কাছে পৌঁছাতে হবে

আমার মনের দ্বিতীয় সঙ্কল্প ছিল, শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পৌঁছানো, কারখানায় কাজ করার পদ্ধতির ভেতর দিয়েই কিভাবে সেখানকার শ্রমিকদের মনে ঐক্যের চেতনা সৃষ্টি হয়—যা পড়েছিলাম মার্কস-এর পুঁথিতে—স্বচক্ষে তা

প্রত্যক্ষ করা, নিজেকে যতদূর সম্ভব তাদের সঙ্গে একাত্ম করা, তাদের সংগঠন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা, পারলে তাতে যোগ দেওয়া।

'অভিযান' কাগজ হাতে থাকায় এ কাজে আরো সুবিধা হল। আমাদের, অন্তত আমার আন্তরিকতা সম্পর্কে ডঃ দত্তের তখন বেশ বিশ্বাস জন্মে গেছে। মনে হল তিনি যেন শিক্ষক ও বন্ধু উভয়রূপেই আমাদের তালিম দেওয়ার ভার নিজে থেকেই গ্রহণ করলেন। 'বন্ধু' বলছি এই কারণে যে বিদ্যা, বয়স ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ হয়েও আমাদের সঙ্গে সমানের মতো ব্যবহার করতেন। তিনি আমাদের চুরুট অফার করতেন, খেতে না চাইলে অমায়িকভাবে বলতেন: বেশ তো, তোমরা নিজের নিজের সিগারেট বের করে ধরাও। কোনো টেররিস্ট বা কংগ্রেসী দাদার পক্ষে এ ব্যবহার অভাবনীয়।

বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায় বিশেষ করে চটকল এলাকায় তিনিই প্রথম আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরান। কারখানার শ্রমিকদের আমরা এতদিন 'কুলি' বলেই জানতাম। তারা কিভাবে থাকে, কাজ করে, তাদের মানসিকতা কি রকম, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। ডঃ দত্তের হাত ধরে তাদের বস্তিতে বস্তিতে সেই প্রথম ঘুরে বেড়ালাম। সেসব বস্তিতে আলোবাতাস তো ঢোকেই না, ধাঙড় মেথরও কখনো ঢোকে বলে মনে হয় না। দু-সারি ঘরের মাঝে সংকীর্ণ পথ, তার মাঝখানে আবার সংকীর্ণতর পঙ্কিল নর্দমা, তার মধ্যে পড়ে আছে মরা বেড়ালের মৃতদেহ। একটু জল হলেই সমস্ত নর্দমার জল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, খাটিয়ার ওপর খাটিয়া তুলে আত্মরক্ষা করতে হয়। তারপর যখন জল সরে যায়, তখনো কিন্তু মরা বেড়ালটা সেই পাঁকের মধ্যেই পড়ে থাকে।

প্রথম প্রথম গা ঘিন ঘিন করত। পরে বস্তি ছেড়ে মানুষগুলোকেই চিনবার চেষ্টা করতে লাগলাম। লেখাপড়া খুব কম লোকে জানে, কিন্তু জানবার আর শুনবার কী আগ্রহ।

চন্দননগরের কাছে গোন্দলপাড়া জুট মিলের শ্রমিকদের সভায় একদিন নিয়ে গেলেন ডঃ দত্ত। হিন্দুস্থানী বাঙালি ইত্যাদি মিলিয়ে হাজারেরও ওপর লোক, কারণ তখন কারখানায় কারখানায় মন্দাজনিত ছাঁটাই-এর খড়্গ ঝুলছে। উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম কোনো কোনো বাঙালি নেতার উর্দু বক্তৃতা—রোটিকা জেহাদ চালু কর দেঙ্গে, সরমায়াদার কৌন কো ময়দানে কারবালেমে দফনায়েঙ্গে···ইত্যাদি ইত্যাদি। এ উর্দু ব্যাকরণ সঙ্গত হল কি না এবং দেহাতি হিন্দুস্থানী মজুরেরা তার রসগ্রহণ করতে পারল কি না জানি না, তবে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। শেষদিকে ডঃ দত্ত

(তিনিই সভাপতি) আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন: মজদুরদের একমাত্র কাগজের সম্পাদক। কিছু বলতেও বললেন। হিন্দি জানি না, বক্তৃতাও কখনো দিই নি, তাই বুদ্ধি করে বললাম: আমি তো বক্তৃতা জানিনে, তবে আমি যা বলতে চাই তা সব এ কাগজে লেখা আছে। সে-হপ্তার 'অভিযান' শ-দুই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম; একখানা তুলে ধরে বললাম: আপনারা পড়ে দেখতে পারেন—দাম মাত্র দুই পয়সা। দেখতে দেখতে দুশো কপি সাফ. এমনই তাদের নিজেদের কথা জানবার আগ্রহ।

ফেরার পথে ডঃ দত্ত বললেন: শ্রীরামপুরে নামা যাক, কাল সকালে ওখানকার বস্তিতে ঘোরা যাবে। রাত প্রায় ন-টা নাগাদ শ্রীরামপুরে পৌঁছালাম। ডঃ দত্ত সোজা গিয়ে উঠলেন কংগ্রেস অফিসে। তখন অতুল্য ঘোষ ঐখানকার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বা সম্পাদক। তাঁকে অফিসেই পাওয়া গেল। ডঃ দত্ত বললেন: রাত্তিরে আমরা এখানেই থাকব। অতুল্যবাবু বললেন: কি বিপদেই ফেললেন ভূপেনদা, এত রাত্তিরে এখন খাবার যোগাড় করি কিভাবে। যাই হোক, কাছাকাছি কোনো বাড়িতে বিয়ে হচ্ছিল, সেখান থেকে খাবার যোগাড় করে আনার আশায় বেরিয়ে পড়লেন অতুল্যবাবু।

কয়েকটি ছেলে ঘরের এক কোণে কি ফিসফিস করছিল। পরে জেনেছিলাম, তাদের মধ্যে একজন আমাদের বর্তমান কমরেড তুষার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বুঝি তখন সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে কি আলাপ হল জানি না, তবে তারা বেরিয়ে যাওয়া মাত্র ডঃ দত্ত বললেন: দেখলে, সারাক্ষণ ফিসফিস করে শুধু 'ফুটুস কলে'র চর্চা করল।

আমি বললাম: কেন রাজনীতি ও সমাজতন্ত্র নিয়েও তো আলোচনা করে থাকতে পারে?

—দূর, তাহলে তো জোরে জোরে করত, আমাকেও জিজ্ঞাসা করত। ফিসফিস মানেই বোমা-পিস্তল।

জানি না তিনি তুষারদের প্রতি সুবিচার করেছিলেন কি না।

এভাবে একদিকে শ্রমিক-আন্দোলনে হাতেখড়ি, রাজনীতিক মহলের সঙ্গে অল্প অল্প পরিচয় আর অন্যদিকে 'অভিযান'-এর দ্রুত অগ্রগতি। দু-এক সংখ্যা পরে বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আমাদের কাছে ডাক আসত তাদের সভায় গিয়ে 'অভিযান'-এর কথা বলতে এবং তাদের অভাব-

অভিযোগ দাবি-দাওয়া ইত্যাদির কথা কাগজটিতে প্রকাশ করতে। এমনকি কোয়ার্টার-মাস্টার্স অর্থাৎ জাহাজী শুখানিদের ইউনিয়ন, যার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয়ই ছিল না এবং যাঁদের চাটগাঁ, নোয়াখালি বা কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষা আমাদের কাছে প্রায় গ্রীকের মত শোনাত, তাঁরাও আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন, শত শত কাগজ কিনেছেন এবং বক্তৃতা দিইয়েছেন। 'অভিযান' যে তখনকার শ্রমিক আন্দোলনের একটা বিরাট অভাব পূর্ণ করছিল এবং তাকে সমর্থনের মধ্যে দলমতের পার্থক্য ছিল না, এটা নিশ্চয়ই তখনকার সেই দলমণ্ডূকতার প্রাবল্যের দিনে আমাদের কাগজের ঐক্যনীতির সাফল্য।

কিন্তু এসব কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। যারা মাত্র বছর দুই আগে সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রায় গোটা নেতৃত্বকেই ছেঁকে ধরে নিয়ে গেছে মীরাটে, তারা এখনই আবার একটা ধনবাদবিরোধী কাগজের বাড়বাড়ন্ত কি করে সহ্য করে? 'অভিযান'-এর ক্রমবর্ধমান জন-প্রিয়তায় উৎফুল্ল হয়ে আমরা যখন পঞ্চম কি ষষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ করেছি, এমন সময় 'শ্বেতদ্বীপের বণিক রাবণ'দের রাজদণ্ড নেমে এল। জামানত দাবি করা 'অভিযান'-এর কাছে। এ দাবি পূরণের মতো আর্থিক সঙ্গতি আমরা কোথায় পাব। সুতরাং বিদায়।

বুড়োদার এক দাদা ছিলেন নাম অনাদি ভাদুড়ি। তিনি বার্লিনে ছিলেন অনেক বছর। সেখানে থাকার সময় এম. এন. রায় ও অন্যান্য অনেক কমিউনিস্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন, পরদেশী কমিউনিস্ট গোষ্ঠীতে কিছুটা সক্রিয় হন, তখনকার ভারতীয় সরকারী কমিউনিস্টদের কারো কারো সঙ্গে বোধহয় কিছু যোগাযোগও স্থাপন করেন। এই হিসাবে মীরাট মামলার নথিপত্রে তাঁর নামও উঠেছিল।

কিন্তু পরবর্তী কালে এম. এন. রায় যখন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে বহিভূর্ত হয়ে নিজের স্বতন্ত্র দল গড়তে আরম্ভ করেন, অনাদি তখন তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

আমরা যখন 'অভিযান' বার করি, তখন অনাদি এ-দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর একটা কি-দুটো লেখা তাঁর এক ভাগ্নে তর্জমা করে 'অভিযান'-এ প্রকাশ করেন। কারণ ভাগ্নের সঙ্গে তাঁর মতের মিল খুব বেশি ছিল। আমার বা আরো অনেকের সঙ্গে বিশেষ কোনো মিল ছিল না, যদিও মতামতের পার্থক্য খুব তীক্ষ্ণভাবে উপলব্ধি বা অনুভব করার মতো মন তখনো তৈরি হয়

নি। তাছাড়া অল্প ভিন্ন মতের দু-একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করলে সর্বনাশ হয়ে হয়ে যাবে, এমনও মনে হত না।

কমিউনিষ্ট হতে হবে

আমার ঝোঁক ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশ যে-কমিউনিস্ট পার্টি তার সঙ্গে যোগাযোগ করব। কিন্তু মীরাট মামলা আর গ্রেপ্তার এবং তারপর গাড়োয়ান স্ট্রাইক ইত্যাদি আন্দোলনে গ্রেপ্তার প্রভৃতির ফলে পুরানো কমিউনিস্ট আর কলকাতায় প্রায় কেউই ছিলেন না। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের এক ভক্ত অবনী চৌধুরী—যিনি আগে সক্রিয় রাজনীতি করেন নি, তাঁর ঘাড়েই দায় চাপল লুপ্তপ্রায় কমিউনিস্ট পার্টিকে দাঁড় করাবার জন্য নতুন দু-চার খানা বাঁশ-বাখারি যোগাড় করার। রণেন সেনের কাছে শুনেছি যে, তিনি এবং আরো দু-একজন অবনীর সঙ্গে জড়ো হন. 'কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু এস. বি. দেশপাণ্ডে, বি টি রনদিভে, এস. জি. সরদেশাই ইত্যাদি পরিচালিত বোম্বাই-এর কমিউনিস্ট পার্টি—যাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ বলে দাবি করতেন —তাঁরা কলকাতা কমিটিকে কোনো পাত্তা দেন নি। তার বদলে জার্মান নামে এক ভাগ্যান্বেষী ও সন্দেহজনক ব্যক্তি তাঁদের প্রতিনিধিরূপে কলকাতায় কাজ করতে থাকেন। কলকাতা কমিটিও প্রায় নামেই থেকে যায়। মীরাট জেলের ভেতর কমিউনিস্ট বন্দীদের মধ্যেও তখন প্রচুর দলাদলি। তাঁদের এক অংশ, যেমন মুজফফ্‌র আহ্‌মেদ ইত্যাদি কলকাতা কমিটির সপক্ষে ছিলেন।

অবনী চৌধুরী লোকটি ছিলেন একটু হেয়ালির মতন। বেশ বুদ্ধিমান এবং চটপটে। খাটতেনও খুব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন যে একেবারে রাজনীতি ছেড়ে চলে গেলেন, তা বোঝা শক্ত।

যাই হোক, তখন বঙ্কিমবাবুর শিষ্য (তার আগে বিপিন গাঙ্গুলির) এবং গাড়োয়ান ধর্মঘটে সাজাপ্রাপ্ত, শ্রমিকনেতা আবদুল মোমিন ছাড়া পেয়েছেন এবং হ্যারিসন রোডে একটা ছোট্ট ঘরে ক'খানা টিনের চেয়ার নিয়ে লুপ্তপ্রায় বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নকে টেনে তুলবার চেষ্টা করছেন। সেই ঘরটাই ছিল আমাদের সকল মতের তরুণদের আড্ডাস্থল।

কমিউনিস্ট আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইতিহাস ও কর্মধারা সম্বন্ধে আমি তখনও একেবারে অর্বাচীন। এসব ব্যাপারে অবনীকেই আমরা 'অথরিটি' মনে করতাম। আর তিনিও অবলীলাক্রমে বলে যেতেন,

"রাইলু'-র (আর, আই, এল, ইউ,) ১৭-নম্বর প্রস্তাব পড়েন নি ? তাহলে ট্রেড ইউনিয়নের কি বুঝবেন ? ই. সি. সি. আই-এর Umpteenth প্লেনামে ন্যাশনাল রিফর্মিস্টদের ভূমিকা সম্বন্ধে অ্যানালিসিস দেখেছেন তো ? আর সঙ্গে সঙ্গে Krestintern-এর latest thesis-টাও দেখে নেবেন—কৃষক আন্দোলনের ভূমিকাটা ভুললে চলবে না তো···।"

আমি একেবারে থ হয়ে যেতাম। ঐসব শব্দগুলোর মানে কি তা জিজ্ঞাসা করারও সাহস হত না।

অবনী আমার সঙ্গে ব্যবহার ভালো বাসতেন, তখনকার লেবার মহলে একজন 'রাইজিং ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে বোধহয় মনের কোণে একটু সমীহও করতেন; কিন্তু সন্দেহও করতেন। কারণটা এই যে, অনাদি ভাদুড়ী আমার আত্মীয়। ভাবতেন, আমি হয়ত 'রায়পন্থী'।

মোমিন ছিল একেবারে অন্য ধরনের—দিলখোলা বন্ধুবৎসল। পাণ্ডিত্যাভিমান একেবারেই ছিল না, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে যতটুকু জানে তা দিয়ে সকল রকমের সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত। গোড়ায় গোড়ায় তাকেও বোধহয় অবনী একটু সন্দেহ করতেন, ভাবতেন, সে তখনো টেররিস্ট আছে।

এই টেররিস্ট ফোবিয়াটাই অবনীকে পেয়ে বসেছিল—বোধহয় উত্তরাধিকার সূত্রে মুজফ্‌ফরের কাছ থেকে। তখনকার দিনে টেররিস্ট মহলেই বিপ্লব সম্বন্ধে আত্মজিজ্ঞাসা সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠছিল; সমাজতন্ত্রের 'রংরুট' পেতে হলে তাদের সম্বন্ধে আন্তরিক সহানুভূতি ও ঘনিষ্ঠতম সংস্পর্শ দরকার। কিন্তু এ রকম লোক দেখলেই অবনী এমনভাবে নাক সিঁটকাতেন যে টেররিস্ট বিপ্লবীদের এদিকে টানা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল।

অবনীরা সহজে দলে নেবে না বুঝতে পারলাম—যদিও 'অবনীরা' বলতে আধ ডজন থেকে এক ডজনের বেশি হবে না। যাই হোক, আমারও রোখ চেপে গেল, ভাবলাম তোমাদের সাহায্য বিনাই শ্রমিকসংগঠন গড়ে তুলব। দেখিয়ে দেব, নিজেই কতখানি পারি।

রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুললাম

তখন অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কায় আগেকার ইউনিয়নগুলোরই প্রায় মর-মর অবস্থা, নতুন ইউনিয়ন গড়া তো আরো দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাই হোক, একটা সুযোগ জুটে গেল।

আমার এক আত্মীয়, বীরেনদা বেলেঘাটায় ই. বি. রেলের (এখনকার ই. আই.) সিগন্যাল কারখানায় ফিটারের কাজ করতেন। তিনি অবশ্য আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না, তবে জানতেন যে আমি শ্রমিক-আন্দোলন করি। তাঁদের কারখানায় ১৩০০ লোক কাজ করত, মন্দার চাপে তার মধ্যে প্রায় হাজার লোকই ছাঁটাই হয়ে গেল। তিনি এসে বললেন: এত লোক ছাঁটাই হয়ে গেল, (তার মধ্যে তিনি নিজেও) কালকে কি খাবে এমন পয়সাও হাতে নেই। এর একটা কোনো উপায় বার করতে পারিস?

—কেন, তোমাদের তো এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন আছে, তারা কিছু করছে না?

—দূর, তারা তো শুধু গার্ড, স্টেশন মাস্টার আর কেরানিদের নিয়েই ব্যস্ত। আমাদের, মজুরদের কাছে কেবল চাঁদা আদায় করে, কাজের বেলা ঢু ঢু!

—ছাঁটাই হলে কিছু দেওয়ার নিয়ম-টিয়ম আছে, জানো?

—তা তো জানিনে—বললেন বীরেনদা। আমি বললাম: আচ্ছা, তোমার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কার্ডখানি দাও। দেখি, একটা কায়দা, করা যায় কি না।

রেলওয়ের নিময়-কানুন সম্বন্ধে 'রেলওয়ে ম্যানুয়াল' আছে শুনেছিলাম। তবে, তা শুধু বড় অফিসারদের কাছে থাকে। ভাবলাম, এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন যখন recognised তখন তাদের কাছেও এক কপি থাকতে পারে। বীরেনদার কার্ড নিয়ে বীরেনদা সেজে আমি নিজেই সার্কুলার রোডে তাদের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। ইউনিয়নের সেক্রেটারি তখন বোধহয় জে. এন. গুপ্ত—একজন রিটায়ার্ড গার্ড, বসে বসে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন।

'আমাদের' সিগন্যাল ওয়ার্কশপের অবস্থাটা তাঁর কাছে বর্ণনা করতে তিনি বললেন: সবই তো জানি, কিন্তু করব কি বলুন, মন্দার বাজারে কে আমাদের কথা শুনছে? চেষ্টা তো আমরা কম করি নি।

বুঝলাম, তাঁরা কিছু করবেন না। সে-কথা চেপে গিয়ে বললাম: আচ্ছা 'রেলওয়ে ম্যানুয়াল'-টা একবার দেখতে পারি?

ম্যানুয়ালটা হাতে, একপাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ একটা ধারা চোখে পড়ল, লেখা আছে: Reduction of Establishment-এর (প্রতিষ্ঠান সংকোচনের) জন্য শ্রমিক ছাঁটাই করলে ছাঁটাই পর্যন্ত শ্রমিকের যত কাজ হয়েছে, তত আধ-মাসের মাইনে গ্র্যাচুইটি দিতে হবে।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম—এতদিনের পুরানো এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, প্রতি মাসে প্রায় সকলের কাছে চাঁদা আদায় করে, অথচ এই নিয়মটুকুও জানে না কিংবা জানলেও কাজে লাগানোর জন্য এতটুকু গা ঘামায় নি।

যাই হোক, ওদের আর-কিছু বললাম না, ধারাটা একটা কাগজে টুকে নিয়ে চলে এলাম। বীরেনদাকে বললাম : যারা ছাঁটাই হয়েছে, তাদের যত লোককে পারো জড়ো করো, আর যারা ছাঁটাই হয় নি, তাদেরও।

মিটিং বসল বেলেঘাটা কনভেন্টের পাশে একটা পোড়ো বাড়ির উঠোনে। সভাপতি—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। মোমিনও বোধহয় এসেছিল। আমাদের গোষ্ঠীরও কয়েক জন ছিল। জমায়েত মন্দ হয় নি। তার আগেই মোমিনের ভাঙা টাইপ-রাইটারে গ্র্যাচুইটির জন্য কয়েক শো দরখাস্ত রাত জেগে টাইপ করে রেখেছিলাম। বক্তৃতা দিলাম সেই প্রথম হিন্দিতে (হিন্দুস্থানীদের চেয়ে বাঙালিরাই সে ভাষা বোধহয় ভালো বুঝলেন)। যাই হোক, অর্থ-নৈতিক সংকট, রেল কোম্পানি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদির যথাসাধ্য মুণ্ডপাত করে দরখাস্তের মর্মটা বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, যাঁরাই ছাঁটাই হয়েছেন, সব দরখাস্তে সই দিন এবং রেজিস্টারি ডাকে রেল কোম্পানিকে পাঠিয়ে দিন। শালারা টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়।

খুব হাততালি। দরখাস্ত সব সাফ হয়ে গেল। যাদের তখনো কাজ আছে, তাঁদের বললাম, ঘু'টে পুড়ছে বলে গোবর যেন না হাসে। হাজার তো গেছেই, বাকি তিনশও যদি থাকতে চায়, তাহলে সবাই মিলে একতা করে ইউনিয়ন করুন। বাবুদের এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন তো আপনাদের ধোকা দিয়েছে—এখন নিজেদের মজদুর ইউনিয়ন তৈরি করুন।

প্রথমে খুব বেশি যে সাড়া পেলাম, তা নয়। কারণ, আমার মুরোদের দৌড় কতটুকু, তা তো আগে দেখতে হবে ?

যাই হোক, গ্র্যাচুইটির দরখাস্তকারদিের পাওনা' টাকা যখন মনি অর্ডার করে আসতে লাগল, তখন সে কী উৎসাহ! আবার মিটিং ডাকলাম—তিন শ-জনের তিন শ-জনই মায় চার্জম্যান পর্যন্ত সেদিনই মেম্বার হয়ে গেল। যারা গ্র্যাচুইটি পেয়েছে, তারা এসে এসে আট আনা করে জমা দিয়ে গেল। ট্যাংরা রোডের ওপর একটা কর্পোরেশন স্কুলের পাশে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে ইউনিয়ন খুলে দিলাম—ই. বি. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। ঘর বাড়ি ছেড়ে আস্তানাও গাড়লাম সেখানে।

একে কাগজ চালিয়েছি পাঁচ হপ্তা, তার ওপর আনকোরা একটা নতুন ইউ-নিয়ন গড়ে ফেললাম প্রায় একক চেষ্টায়—আমার 'প্রেস্টিজ' তখন বেশ 'হাই'।

কিন্তু তবু অবনীরা দলে ডাকে নি। চটে-মটে স্থির করলাম, একটা

আলাদা কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করে ফেলব। তখন ভবানী সেনের সঙ্গে অল্প দিন হল আলাপ হয়েছে। তারও ইচ্ছা ছিল কমিউনিস্ট পার্টিতে আসা, কিন্তু আমাকে যাও বা পাত্তা দেয়, তাকে তা-ও দেয় না।

একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে আমি, ভবানী সেন, রামরাঘব লাহিড়ী এবং বোধ হয় পরেশ নামে একজন (ইনি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'Road to Freedom' সন্ত তর্জমা করেছেন) বসে স্থির করলাম, আমরা একটা কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করব।

হায়-রে কপাল! ক-দিন পরেই শুনলাম, ভবানী সেনকে ধরে নিয়ে গিয়ে ডেটিনিউ করেছে, রামরাঘব বোধহয় ফেরার, পরেশকে দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং প্ল্যান ভেস্তে গেল।

এদিকে গান্ধীজী-পরিচালিত লবণ সত্যাগ্রহ তখন গান্ধীজীর আরোপিত সীমার মধ্যে স্তব্ধ থাকে নি। সরকার গান্ধীকে জেলের বাইরেই রেখে দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর চোখের সামনেই তাঁরই আন্দোলন জনগণের মধ্যে সারা দেশ জুড়ে এমন আগুন জ্বালিয়ে দিল—যা ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের রূপ তো গ্রহণ করলই, উপরন্তু কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী সকল দেশভক্তকেই নিজ নিজ পন্থায় সংগ্রামে নামাল। শ্রমিকশ্রেণী নামল বড় বড় ধর্মঘট ও বিক্ষোভ যাত্রায়, স্থানে স্থানে কৃষকরা খাজনা বন্ধ করল। সশস্ত্র সংগ্রামে ক্ষমতা দখল-প্রচেষ্টার ইঙ্গিত আনল চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। পেশোয়ার শহরে সমগ্র জনতার বিক্ষোভের মুখে পুলিশ অসহায়ভাবে পলায়ন করল, শহরের পরিচালনার ভার এসে গেল জনগণের হাতে। আর ব্রিটিশ সরকার স্তম্ভিত হয়ে দেখল সেই বিপ্লবী দেশবাসী ভাইদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করছে সরকারের চিরবশংবদ গাড়োয়ালি সৈন্যদল। তখনই তারা গ্রেপ্তার করল গান্ধীজীকে, জানিয়ে দিল যে গান্ধীজী তাঁর শৃংখলাহীন অনুগামীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না বলে এই গ্রেপ্তার।

সেই গ্রেপ্তার আবার নতুন করে আগুন জ্বালালো। শোলাপুর শহরে সুতাকল শ্রমিকদের নেতৃত্বে শহরবাসীরা শহরই দখল করে ফেলল, সপ্তাহখানেক তারাই ক্ষমতা পরিচালনা করল, শেষপর্যন্ত তাদের দমন করতে হল মার্শাল জারি করে।

সরকারী দমন পীড়নকে চরমে তুলে, ৯০ হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করে

সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনকে বেআইনী করে—তবুও শাসক সম্প্রদায়ের আতঙ্ক বেড়েই চলল। বোম্বাইয়ের দেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিশে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত ভারতের জন্য স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা দাবি করল। 'অবজার্ভার' কাগজের খবর অনুসারে কলকাতা ও বোম্বাইয়ে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা কংগ্রেসীদের কাছে প্রায় আত্মসমর্পণের প্রস্তাব আনল।

এভাবে আন্দোলন যখন শিখর থেকে শিখরে উন্নীত হচ্ছে, শত্রুপক্ষের আতঙ্ক যখন রাষ্ট্রীয় আত্মসমর্পণের কথাও চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে, গণ-সংগ্রাম যখন সকল সীমারেখা অতিক্রম করে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে, তখন শুধু সাম্রাজ্যবাদই নয়, জেলের ভেতর থেকে গান্ধীজীও গণশক্তির এই অ-পূর্ব-পরিকল্পিত বিস্ফোরণে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে জেলে দেখা করে প্রফেসর আলেকজেণ্ডার জানালেন যে, (ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে) "এ রকম তিক্ততা যে বেড়ে উঠছে, জেলের নির্জনতার মধ্যেও তিনি (গান্ধীজী) সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং সেই কারণে শান্তি ও সহযোগিতায় প্রত্যাবর্তনকে তিনি স্বাগত করবেন যখনই তা সংভাবে পাওয়া যেতে পারে" (৩ জানুয়ারি, ১৯৩১)।

তখন বিলাতে কংগ্রেস কর্তৃক বর্জিত রাউণ্ডটেবিল চলছে। ২০ জানুয়ারি, ১৯৩১-এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ভারতের জন্যে ডোমিনিয়ান স্টেটাস ও দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত শাসনের অস্পষ্ট আশা ব্যক্ত করলেন।

কংগ্রেস যাতে যোগ দিতে পারে সেজন্যে গোলটেবিল বৈঠক স্থগিত রেখে ২৬ জানুয়ারি গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দেওয়া হল। ৪ মার্চ গান্ধী আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার মতো আন্দোলন, মুলতবী রাখা হল।

বেআইনী-ঘোষিত কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারি চুক্তি করতে বাধ্য হল, তাতে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি প্রকট হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ছাড়া চুক্তির নতুন কোনো অধিকার অর্জিত হয় নি বা অর্জিত হওয়ার নিশ্চয়তাও পাওয়া যায় নি। যে উত্তপ্ত হৃদয়গুলি হিমশীতল রাভি নদীর তীরেও পূর্ণ স্বাধীনতা আর ব্রিটিশের সঙ্গে পূর্ণ সম্পর্ক ছেদের আগুন জ্বালাতে পেরেছিল তারা এবং তাদের প্রতিজ্ঞা এখন যেন রাভি নদীরই গভীর অতলে তলিয়ে গেল।

ভগৎ সিং-এর ফাঁসি

গান্ধী-আরুইন চুক্তির পেছনে ব্রিটিশ সরকারের কি কদর্য স্বরূপ লুকিয়ে-

ছিল, তা প্রকট হয়ে উঠল কয়েক দিনের মধ্যে। চুক্তিকে যেন প্রকাশ্যেই কষাঘাত করে, ফাঁসিতে চড়িয়ে দেওয়া হল ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মী রাজগুরু ও সুখদেওকে—১৯ মার্চ, ১৯৩১। যে একটি মাত্র মানুষ অন্তত কিছুকালের জন্য দেশের মনের মধ্যে গান্ধীজীর চেয়েও প্রিয়তর আসন অধিকার করতে পেরেছিল—সে মানুষ ভগৎ সিং। ভারতীয় জনগণের প্রিয়তম সন্তানের শিরশ্ছেদ করে অগ্রসর হল চুক্তির প্রতিশ্রুতি।

চুক্তি অনুমোদনের জন্য এবং অন্যান্য কর্মধারা স্থির করার জন্য করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা হয়েছিল মার্চ মাসের শেষে। অন্য অনেক তরুণের মতো আমার মনেও তখন এই চুক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। ইচ্ছে হল, করাচী কংগ্রেসে গিয়ে চুক্তির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আসি।

কিভাবে যাব? কংগ্রেসের সঙ্গে কখনো কোনো সম্বন্ধ ছিলনা, চার-আনার সভ্যও নই, ডেলিগেট হব কি করে?

আমরা ছেলেবেলায় শান্তিপুরে থাকতাম, বীরেনদাও থাকতেন। তিনি আগে কংগ্রেসের কিছু কিছু কাজ করতেন বলে শান্তিপুর কংগ্রেসের সম্পাদক প্রয়াত ফণি খাঁ-র সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। আমারও পরিচয় ছিল। বীরেনদা বললেন: ফণিকে বলে তোকে ডেলিগেট করিয়ে দেব। তোর তো এখন একটু নামটাম হয়েছে, অসুবিধা হবে না।

হলও তাই। নদীয়া জেলা থেকে করাচী কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়ে গেলাম।

আমি যাচ্ছি শুনে অনাদিদার সেই ভাগ্নে—সে-ও চলল। সে অবশ্য ডেলিগেট ছিল না, তবে বেশ পাকা রায়পন্থী হয়ে উঠেছিল। ওখানে গিয়ে অন্যান্য রায়পন্থীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করাই তার উদ্দেশ্য। আমার তাতে অসুবিধার কিছু নেই, কারণ আমি তখনও নির্দল।

করাচী কংগ্রেসে

সেই প্রথম কংগ্রেসের ভেতর থেকে কংগ্রেস দেখলাম। পয়সা-কড়ির খুব টানাটানি, পাঁচ টাকা ডেলিগেট ফি কোথায় পাব? ভাগ্যে মোমিন ছিল, নিয়ে গেল প্রয়াত হেমন্ত বসুর কাছে। জে. এম. সেনগুপ্তপন্থী গোষ্ঠীর তিনিই খাজাঞ্চি। খুব আনন্দের সঙ্গে পাঁচ টাকা দিয়ে ডেলিগেট করিয়ে দিলেন। যিনি যে গোষ্ঠীরই হোন, বাঙলাদেশের অনেকের মনে চুক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট

বিক্ষোভ ছিল। সুতরাং আমাকে ডেলিগেট করে হেমন্তবাবু বরং সন্তোষই পেলেন।

বিশেষ করে ভগৎ সিং-এর ব্যাপার নিয়ে তরুণদের রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে। হাজার হাজার ছেলে এসেছিল পাঞ্জাব আর সিন্ধু থেকে। গান্ধীজী যখন বিক্ষোভ এড়াবার আশায় করাচী থেকে ১২ মাইল দূর স্টেশনে নামলেন, তাতেও কিন্তু রেহাই পেলেন না। শোকার্ত তরুণের দল ক্রুদ্ধ অথচ শান্তভাবে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা জানাল, তাঁর হাতে কালো গোলাপের গুচ্ছ তুলে দিয়ে।

বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রমিক মহলেও। ডক শ্রমিকদের মিছিল বেরুল বিকালবেলায়, সঙ্গে যোগ দিল হাজার হাজার তরুণ ডেলিগেট ও বিক্ষুব্ধ মানুষ। মোমিন, আমি, অবনী (অবনীও এসেছিল, যদিও সে ডেলিগেট নয়) ইত্যাদি বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিয়েছিলাম।

কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। সামনে কালিমাখা এবং বেশির উর্দু ভাষী শ্রমিক ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে লাল ঝাণ্ডা, আর তাদের পেছনে অগণিত স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী তরুণ। গান তুলল শ্রমিকরাই প্রথম—শ্রমিকরা যে নিজে থেকেই রাজনৈতিক গান তুলতে পারে, তা আমি কিন্তু কলকাতায় দেখি নি। আর সে কি গান! কাকোরি মামলার ফাঁসির দড়িতে যিনি প্রাণ দিয়েছিলেন সেই রামপ্রসাদ বিসমিলের দুর্দান্ত আক্রোশের গান :

"সরফরোশী কী তমন্না অব হমারে দিল মে হ্যায় / দেখনা হ্যায় কিতনা জোর ইয়ে বাজু কাতিল মে হ্যায়।"

(মাথা কিনবার ইচ্ছে আজকে মনের মধ্যে জাগে, এই খুনেদের হাতে কত জোর দেখে নিতে হবে আগে।)

মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি : ভগৎ সিং—জিন্দাবাদ। গান্ধী আরুইন সমঝোতা—মুর্দাবাদ! সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছলে শ্রমিকরা নিজেরাই আরেকটা গান ধরল তার শুধু সামান্য একটু রেশ মনে আছে :

ইনকালাব হায়, ইনকালাব হায়, ইনকালাব

... ...

ইনকালাব হামারে ফিদা হায়

ম্যায় ফিদা হু ইনকালাব.

(বিপ্লবে আমার স্বার্থ, আমি বিপ্লবের স্বার্থ।)

তারপরই গগনভেদী আওয়াজ উঠল : ইনকালাব—জিন্দাবাদ!

শ্রমিক-আন্দোলন কিছু কিছু কিছু করেছি এবং দেখেছি বটে, কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে এমনধারা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বাঙ্ময়তা এর আগে দেখি নি। মানুষের মনের মেজাজ এমনই উত্তপ্ত, তা সত্ত্বেও ভগৎ সিং-এর ফাঁসির ওপরে গান্ধীজী কংগ্রেসে যে প্রস্তাব পাস করালেন, তার প্রথম কথাই হল রাজনৈতিক হিংসাকে কংগ্রেস অনুমোদন করে না এবং তার থেকে কংগ্রেস নিজেকে তফাত করে রাখছে।

অবনী ক-দিন ধরে দেশপাণ্ডে সরদেশাই ইত্যাদির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন—বোধহয়, তাঁদের কলকাতা কমিটির স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। কিন্তু মনে হল, তাঁরা ওকে পাত্তা দেন নি। তবে কমিউনিস্ট পার্টির 'ড্রাফট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন' (খসড়া কর্মনীতি) সংবলিত ছাপানো হাণ্ডবিল ওঁর হাতে গছিয়ে দিয়েছিলেন। তখন খুব ভালো করে পড়ি নি, শুধু এটুকুই মাথায় ঢুকেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টির আশু দাবি হল ভারতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ওদিকে রায়পন্থীরাও যতদূর মনে পড়ে একটা অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের হাণ্ডবিল দিয়ে দাবি করেছিল যে, ভারতে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি (গণ-পরিষদ) আহ্বান করতে হবে।

এম এন রায়

এই হ্যাণ্ডবিলটা পেলাম অনাদির ভাগ্নের কাছে। সে আস্তে আস্তে বলল, আমার কজন রয়িস্ট বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করবি? তুই না হয় নির্দল, তাতে আলাপ করতে দোষ কি?

যেখানে মাঝারি লিডারদের ক্যাম্প, একদিন দুপুরবেলা সেখানে আমাকে নিয়ে গেল একটি ক্যাম্পের মধ্যে। সেখানে ছিলেন সুন্দর কাবাডি আর তৈয়ব শেখ। আরো আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আমার স্কুলের এক সহপাঠী বিনু ব্যানার্জিও হাজির এবং এঁরা সকলে ভক্তিভরে আলাপ করছেন এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোকের সঙ্গে, যাঁকে 'মিঃ ব্যানার্জি' বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। (আলাপ করে ফেরার পথে ভাগ্নে কানে কানে বলে দিয়েছিল, ঐ ব্যানার্জিই এম. এন. রায়)। তিনি সোনার চেনসহ একটা বেশ বড় পকেট ঘড়ি হাতে নাচাতে নাচাতে তৈয়ব শেখকে উপদেশ দিচ্ছিলেন: বক্তৃতার সময় স্যাটানিক গভর্নমেন্ট, জালিম সরকার এসব কথার উপরই বেশি জোর দেবে। এতেই লোকের মন পাবে।

বিনু (জে কে ব্যানার্জি) কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করল : সোনার ঘড়ি কোথায় পেলেন ?

বেশ আত্মপ্রসাদের সুরেই যেন রায় বললেন : কালাকাংকারের রাণীর কাছ থেকে। (পরে বুঝেছি, কালাকাংকারের রাজার ভাই ব্রজেশ সিং, যিনি জার্মানিতে এম এন রায়ের সহকর্মী ছিলেন, তাঁর কাছেই বোধহয় প্রথম গোপন আশ্রয় পেয়েছিলেন এম এন রায়। মনে রাখতে হবে যে, এম এন রায়ও মীরাট মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত এবং সরকারী হিসাবে তখন ফেরারি)।

তারপর দেশ বিদেশের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কথা হল। ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে কিভাবে কাজ করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা হল। উপস্থিত রায়পন্থীদের ঝোঁকটা হল কমিউনিস্টদের পাল্টা ইউনিয়ন গড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। আমি বললাম, তার কি দরকার? Virgin field তো অনেক আছে, যেখানে অর্গানাইজ করা যায়। আমাদের ই বি রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদাহরণও দিলাম। রায় মোটামুটি আমাকেই সমর্থন করলেন।

দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে উঠে পড়তে হল। রায় আবার একদিন আসতে বললেন।

কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাব ছিল—গান্ধী আরুইন চুক্তি অনুমোদন এবং গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজীকে মনোনয়ন।

কিন্তু সংগঠনের কী মহিমা! আমি অবাক হয়ে দেখলাম, অন্যান্য নেতারা তো বটেই এমন কি নেহরু বা সুভাষ চন্দ্রও চুক্তির বিরুদ্ধে মুখ খুললেন না। বিপক্ষে প্রধান বক্তা ছিলেন যমুনা দাস মেহতা, বোম্বাই কমিউনিস্ট পার্টির তরফে সরদেশাই, আমাদের মতো নির্দল বাঙালিদের তরফে মোমিন—এ রকম সব অল্প পরিচিত কর্মী।

গান্ধীজী কেঁদেই মাত করে দিলেন। বললেন : আমি বুড়ো হয়ে গেছি, এর বেশি আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

মোমিনের হিসাব অনুসারে চুক্তির পক্ষে ভোট হয়েছিল ১৪০০ আর বিপক্ষে ৩৫০।

পরদিন ভাগ্নে আবার রায়ের কাছে নিয়ে গেল। সাঙ্গপাঙ্গরাও তখনই এসেছেন। রায় খুব 'সিরিয়াসলি' বললেন :

কাল রাত্রে একটু কায়দা করে হঠাৎ আমি নেহরুর ক্যাম্পে হাজির হই।

নেহরু একেবারে হতভম্ব! যাই হোক, তাঁকে বোঝালাম চুক্তির ব্যাপারটা যা হবার হয়ে গেছে, কংগ্রেসের জন্য অন্তত একটা ইকনমিক প্রোগ্রাম তো করুন। তোমাদের হ্যাণ্ডবিল থেকে দাবিগুলো দেখিয়ে ঐ রকম কোনো-একটা অর্থনৈতিক অধিকার-সম্পর্কিত প্রস্তাব আনতে অনুরোধ করলাম। নেহেরু মনে হল রাজি হয়েছেন। বললেন, দেখি, কি করা যায়।

[এ-বিষয়ে রায়ের বক্তব্য এতদিন সব হুবহু বলতে পারছি না। তবে মোদ্দা কথাটা এ রকমই ছিল ।]

করাচী কংগ্রেসের যেটুকু বাস্তব অবদান তা তার 'মৌলিক অধিকার'-এর প্রস্তাব, যাতে শ্রমিক ও কৃষকদের কিছু কিছু দাবি স্বীকৃত হয়েছে, মূল-শিল্প প্রভৃতির জাতীয়করণ বা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে এবং আরো কিছু প্রগতিশীল অগ্রগতি ঘটেছে। রায়ের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে, এ ব্যাপারে তাঁরও ভূমিকা একেবারে নগণ্য নয়।

নেহরু অবশ্য এ কথা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন : করাচীতে এম. এন. রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল পাঁচ মিনিট মাত্র এবং 'মৌলিক অধিকার'-এর প্রস্তাব করার সঙ্গে এম. এন. রায়ের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না (নেহরুর ইংরাজি আত্মজীবনী, পৃঃ ২৬৮)।

নেহরুর সঙ্গে দেখা করে এসে সদ্য সদ্য এম. এন. রায় যা বলেছিলেন তা একেবারে অবিশ্বাস করা শক্ত। বিশেষ করে 'মৌলিক অধিকার'-এর প্রস্তাব যখন সত্যি সত্যি কংগ্রেসে এলো। তবে, এম. এন. রায় যদি এ প্রস্তাব দিয়েও থাকেন, নেহরু তথা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তার অদলবদল করবেন, তা খুবই সম্ভব।

যাই হোক, দুই বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করার এখন আর কোনো উপায় নেই।

ফেরারি আসামী এম. এন. রায়ের করাচীতে উপস্থিতি সম্বন্ধে আমার মনে বহুদিন ধরে একটা খট্‌কা ছিল। তিনি যে-রকম অনায়াসে চলাফেরা করতেন এবং অনেক লোকের সঙ্গে দেখাশোনা করতেন, তাতে কংগ্রেস-নগরীতে—যেখানে পুলিশের গুপ্তচর গিজ্‌গিজ করছে, সেখান থেকে তিনি অক্ষত দেহে ফিরে যেতে পারলেন কি করে?

মাত্র গতবছর এর একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ শুনলাম বেহালার সমরেন রায়ের কাছে। 'এম. এন. রায়ের জীবনী' সম্বন্ধে তিনি অনেকদিন গবেষণা করছেন। তিনি বললেন : মীরাট মামলার সরকারী ব্যারিস্টার

ল্যাংফোর্ড জেম্‌স-এর জুনিয়র জে পি মিত্তির তাঁকে বলেছেন যে, করাচীতে যাতে তাকে গ্রেপ্তার করা না হয়, তার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন ল্যাংফোর্ড জেমস। তখন মীরাট মামলার শুনানি প্রায় শেষ হয়েছে, তাই ল্যাংফোর্ড জেমস চান নি যে শুনানি শেষ হবার আগে ঐ মামলায় ফেরারি আসামী এম এন রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়; কারণ তখন তাকে গ্রেপ্তার করলে ঐ চার বছরব্যাপী মামলা আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হত। সে জন্যই সরকার এম. এন. রায়কে করাচীতে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেন নি—এই হল সমরেন রায়ের অভিমত।

ক্ষুণ্ণমনে করাচী থেকে ফিরলাম। তখন প্রধান কাজ দাঁড়াল—ই বি রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে প্রসারিত করা। প্রতিদ্বন্দ্বী এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বহুদিনের ইউনিয়ন, বেশ শক্তিশালী, তার ওপর রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত। তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো খুবই কঠিন।

কিন্তু ঐ ইউনিয়নের দুর্বলতা ছিল যে, শ্রমিক ও কারিগরদের সঙ্গে তাদের প্রায় বাবু-ভৃত্য সম্পর্ক। আর আমরা শুরু করলাম একেবারে শ্রমিক থেকেই। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম—কী সংগঠন-প্রতিভা এই অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত হাতুড়িপেটা মানুষগুলির মধ্যে। তারাই তাদের বন্ধু ও আত্মীয় রেল-শ্রমিকদের মারফত ইউনিয়নকে ছড়িয়ে দিল ইলেক-ট্রিকাল বিভাগে, 'পার্মানেন্ট ওয়ে'তে, এমন কি 'ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডে'-ও। এভাবে মাত্র পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে একটা ইউনিয়নের বিস্তার কম কথা নয়। কিন্তু তার কৃতিত্ব প্রধানত ঐ ঘর্মাক্তকলেবর শক্তপেশী অথচ চিরনির্যাতিত শ্রমিক ভাইদের।

এ আই টি ইউ সি'র ভাঙন

করাচীর মনস্তাপ শেষ হতে না হতে জুলাই মাসে কলকাতায় অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। তখন টি ইউ সি-র মধ্যে একদিকে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক নেতারা (কমিউনিস্টরা এঁদের বলতেন—ন্যাশনাল রিফর্মিস্ট এবং তাঁদের তদানীন্তন চিন্তাধারা অনুসারে শ্রমিকশ্রেণী থেকে এঁদের বিচ্ছিন্ন করাই প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন—যদিও কমিউনিস্টদের নিজেদের সংখ্যাই এত কম যে সে-ইচ্ছা বিশেষ পূর্ণ হত না)। আর অন্যদিকে কমিউনিস্টরা, যাদের বিরুদ্ধে প্রায়

সমপরিমাণ উগ্রতা ছিল জাতীয়তাবাদীদের। এই জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ছিলেন রায়পন্থীরাও।

কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (বর্তমান কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস-এ) এ আই টি ইউ সি দুভাগ হয়ে গেল। আমার রেল ইউনিয়নের বয়স তখনো একবছর পূর্ণ হয় নি, কাজেই তা এ আই টি ইউ সি-র মধ্যে সংযুক্ত হতে পারে নি। অ্যালবার্ট হলের বাইরে হিন্দু স্কুলের কাছে দাঁড়িয়েই মল্লযুদ্ধের আওয়াজ শুনলাম, ছুটোছুটি দেখলাম। রায়পন্থী ভি ভি কর্নিকের সঙ্গে দেখা হল, তিনি আমাকে কমিউনিস্ট বলেই মনে করতেন। বিদ্রূপ করে বললেন: So now you have accomplished your November Revolution।

হেসে জবাব দিলাম: No, no, this is only a July uprising। আগে আপনাদের 'কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি' বসুক তারপর তো 'সোভিয়েট' আপনাদের ক্ষমতা কেড়ে নেবে।

কিন্তু এ ভাঙাভাঙি আমার একেবারেই ভালো লাগে নি। অর্থনৈতিক সংকটের নামে শ্রমিকের ওপর যখন আঘাতের পর আঘাত বাজছে লক্ষ লক্ষ ছাঁটাই হচ্ছে, তাদের আত্মরক্ষার সংগ্রামগুলিকে পর্যন্ত অনশন, লাঠি ও গুলির চাপে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, তখন একতাই তো সবসময় প্রয়োজন। কিন্তু কাকে সেকথা বলব?

পার্টি-সভ্য হবার আগে যে বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করতে হচ্ছে, কিছু ভালো আবার অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে, তার মধ্যেও পরম আনন্দের এক ঘটনা ঘটল।

গত শারদীয়া সংখ্যায় লিখেছিলাম—"দুঃসাহসিক পরিকল্পনা মাথায় এলো—বাংলা ভাষায় মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বই লিখব। তখনো পর্যন্ত এ কাজ করতে কেউ এগোয় নি। কিন্তু আমি বেপরোয়া।"

'সাম্যবাদ' নাম দিয়ে সেই লেখা প্রথমে খানিকটা সাপ্তাহিক 'অভিযান'-এ ধারাবাহিকভাবে বার হয়। কাগজটি বন্ধ হয়ে গেলে গোলাপ প্রেসের প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভক্ত বন্ধুরা বললেন: প্রেমেনবাবু 'সংবাদ' বলে একটি সাপ্তাহিক সম্পাদনা করছেন, তিনি ঐ রকম একটি লেখা চান। তাঁরাই আমার লেখাটা সাগ্রহে নিয়ে গিয়ে প্রেমেনবাবুকে দিলেন (যদিও কি তখন কি এখন, প্রেমেনবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি)।

'সমাজ-সাম্যবাদ' নাম দিয়ে লেখাটি ধারাবাহিকভাবে 'সংবাদ'-এ বেরোতে থাকে, কিন্তু অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়—'সংবাদ' কাগজও বন্ধ হয়ে গেল।

এখন এই ১৯৭১-এর জুলাই মাসে গোলাপ প্রেসের বড়দার সহায়তায় লেখাটি 'সাম্যবাদ' নামে বই হয়ে বার হল। তার মর্মবাণী ওয়াল্ট হুইট-ম্যানের ভাষায় ঐ বইয়েরই প্রচ্ছদে রেখাঙ্কিত :

All the past we have behind,
We debouch upon a newer.
mighter world,
varied world.
Fresh and strong the world we
seize, world of labour
and the march
Pioneers ! O Pioneers !

টাটার দাস-নগরে কয়েকটি ঋতু

টাটা লোহা ও ইস্পাত কোম্পানিকে রক্ষণ শুল্ক (ট্যারিফ) দেওয়া হবে কি না তাই নিয়ে ১৯৩৩-এ ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড বিবেচনা করছিলেন। সে সময়ে আমি সাময়িকভাবে জামশেদপুর লেবার ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ফেডারেশনের তরফ থেকে ট্যারিফ কমিশনের জন্য আমি একটি স্মারকলিপি তৈরি করি এবং ফেডারেশনের তখনকার নেতা ও কোষাধ্যক্ষ সর্দার মঙ্গল সিং-এর নামে সেটি কমিশনের কাছে পাঠানো হয়। স্মারকলিপিটি (তারিখ : ২৫ অক্টোবর ১৯৩৩) ট্যারিফ কমিশনের রিপোর্টের সাক্ষ্য সংক্রান্ত অংশে এখনো মুদ্রিত আছে।

টাটা কোম্পানির সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী ধনিক প্রতিনিধিদের কি সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে ঐ লিপি থেকে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তখনকার দিনে আমার মতো অর্বাচীন কমিউনিস্ট-মনে নিজের প্রায় একক চেষ্টায় এসব ব্যাপারে যে রকমের ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল তারও কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি হল ভারতকে কাঁচা মালের মজুত ভাণ্ডার হিসেবে ফেলে রাখা, কাঁচা মাল পাওয়ার জন্য যেটুকু শিল্প দরকার শুধু সেটুকুই স্থাপন করা—এই কারণেই দুশো বছর ধরে শিল্পসমৃদ্ধ বৃটেনের সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও ভারতে কোনো ভারী শিল্প গড়ে ওঠে নি। তবে রেলওয়ে প্রভৃতি বিকাশের সুযোগে দেশী শিল্পপতিরা নিজেরাই শিল্প স্থাপন করতে আরম্ভ করেন এবং জামশেদপুরের টাটা কোম্পানি তারই অন্যতম উদাহরণ। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিরুৎসাহিত করারই চেষ্টা করেছিলেন; তদানীন্তন সরকারের জনৈক সদস্য উপহাস করে বলেছিলেন যে টাটারা যত পাউণ্ড ইস্পাত উৎপাদন করবে তার সবটাই তিনি গিলে ফেলতে পারবেন।

যুদ্ধ ও টাটা

কিন্তু তাঁদের ঐ মত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বদলাতে আরম্ভ করে বলে মন্তব্য করে স্মারকলিপিতে লেখা হয়ঃ

"...It was from this time that the government began to consider the possibility of creating an Indian base for the manufacture of materials necessary for war and as such their attention was drawn to the steel Company of Jamshedpur. The cables, telegrams and letters that passed between the Tata Co., the govt. of India and the Suretry of State for India are ample evidence of this. From this time we find the govt. supporting and helping the Steel Company....

"This sympathy and support culminated in the grant of tariff to the steel industry in 1926 by the legislature. The representatives of the Indian bourgeoisie from the Indian national Congress...gladly supported the govt. move for tariff and thus paved the way for future imperialist wars....

"But even now British Capitalism (which has developed into imperialism) is unwilling to see the indegenious production of steel increased. The weekly 'Capital' writes under date 12th October 1933,... One possible line of action is to continue protection (for Tata) on condition that Production is not

increased. The revenue could then be kept up and stock of the sort of steel required for war purposes built….

"However…production for profits only led to the world economic crisis…(which) did not fail to visit the Indian steel industry though, in accordance with the unevenness of Capitalist development it was in a lesser degree .

"The production of coke, pig iron, steel ingots and saleable steel, taken together, was 2,562,328 Tons in 1931-32 and 2,471,880 Tons in 1932-33 which means a decrease of nearly a hundred thousand Tons….

"The total number of men employed was according to the report of the Whitley Commission, 28,660 in 1929-30 and in 1932-33 it was less than 20 thousand which means that nearly 9 thousand men have been robbed of their jobs…the Company payed as wages in March, 1929 Rs. 8,94,000, in March 1932 Rs. 7,99,918 and in March 1933 Rs. 7,81,918 only…."

এরপর স্মারকলিপিতে সংকটগত আরো নানা রকম অত্যাচারের বর্ণনা এবং সংকট মোচনের জন্য শ্রমিকদের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট দাবি উপস্থিত করে উপসংহারে বলা হয়েছে :

"Imperialism is fast moving towards another world war and this has again brought to the forefront of British imperialism the question of Indian steel industry. To ensure the supply of war meterials imperialism has again raised the question of granting tariffs to the steel industry. This particular motive behind the grant of protection should make the idea of steel tariff particularly repugnant to all who are not imperialists…

"The only way out of the crisis…is to do away with the Capitalist system of production. So, as we present this to the tariff board, simultaneously we call upon the workers of Jamshedpur to mobilise themselves on the basis of the specific demands set

in here, to protest aginst the grant of tariff and to fight for the achievement of there object."

আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতার প্রাথমিক যুগে আমরা যে শুধু অর্থনীতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম না, সাহসের সঙ্গে সমগ্র রাজনীতি নিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর কাছে হাজির হবার চেষ্টা করতাম—স্মারকলিপিটি তার একটি সামান্য নমুনা।

ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক দাঁতঁ বলেছিলেন যে, বিপ্লবের জন্য চাই, "দ লোদাস, অংকোর দ লোদাস, এ তুজুর দ লোদাস"—অর্থাৎ দুঃসাহস, আবার দুঃসাহস এবং সর্বদা দুঃসাহস!

আমরা যখন পার্টি গড়ার কাজ আরম্ভ করি, তখন আমাদের আর যা অভাবই থাক, অন্তত দুঃসাহসের অভাব ছিল না। জামশেদপুরে কখনো যাই নি, কারখানাটি পর্যন্ত দেখি নি, টাটা কোম্পানির কোনো খবর রাখি না। তবু আমাদের সেই কয়েক ডজনের পার্টি থেকে যেই অনুরোধ এলো "জামশেদপুরে যাও", অমনি রওনা। অগ্রপশ্চাৎ ভাবনায় কালক্ষেপ করতে হয় নি। আবার, যাওয়ার দু-চার মাসের মধ্যেই যেই জামশেদপুর লেবার ফেডারেশনের নেতারা ধরলেন—ট্যারিফ কমিশনকে মেমোরাণ্ডাম লিখে দিন, তখনও অম্লান বদনে সেই দুঃসাহসিক কাজ (তখনকার বয়স, বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বিবেচনায়) হাতে নিলাম।

ননীগোপাল মুখার্জি

বিশের দশকের প্রায় শেষ দিক পর্যন্ত জামশেদপুরে গান্ধীজী প্রভৃতি অনুমোদিত এবং সি এফ এনড্রুজ পরিচালিত লেবার অ্যাসোসিয়েশনই ছিল একমাত্র শ্রমিক সংগঠন। গান্ধীজীর শ্রমিক দর্শন অনুযায়ী স্বভাবতই অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নীতি ছিল মালিক ও শ্রমিকের শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথে আপস-মীমাংসা। কিন্তু ননীগোপাল মুখার্জি নামে এক বিপ্লবী যুবক, যিনি প্রায় কিশোর বয়সে আন্দামানে জেল খেটেছিলেন এবং বৃটিশের নানা বন্দীশালার অকথ্য নির্যাতনের সামনেও কখনো মাথা নোয়ান নি—তিনি লেবার অ্যাসোসিয়েশনের স্রোতহীন শান্তিপ্রিয়তার মধ্যে সংগ্রামী তৎপরতার এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তাঁর চেষ্টায় পরপর কয়েকটি ডিপার্টমেন্টে ধর্মঘট সংগঠিত হয় এবং কিছু কিছু দাবিও আদায় হয়

(উল্লেখযোগ্য যে, এর বেশ কয়েকবছর পরে কলকাতায় থাকার সময় কমরেড ননীগোপাল কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন)।

লেবার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব ননীগোপাল কর্তৃক পরিচালিত ধর্মঘট-গুলিকে নামঞ্জুর করে। অপরদিকে মানেক হোমি নামে টাটার এক ভূতপূর্ব কর্মচারী ও ভাগ্যান্বেষী লেবার ফেডারেশন নাম দিয়ে আরেকটি সংগঠন গড়ে তোলেন। নামঞ্জুর ধর্মঘটের অধিকাংশ যোগদানকারীকে তিনি তাঁর সংগঠনে টেনে নেওয়ায় লেবার ফেডারেশন বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হোমির নিমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্রও জামশেদপুরে এসেছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত হোমির সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে লেবার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে।

যাই হোক, এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে টাটা এবং স্থানীয় প্রশাসনও নানাভাবে দুই সংগঠনকেই দুর্বল করার চেষ্টা করে।

বিভীষিকা

সম্ভবত ১৯২৮ থেকে জামশেদপুর শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দেখা দেয় এক নতুন দৃশ্য। শ্রমিকরা—তা সে যে পক্ষেরই হোক—যখনই কোনো সভা-সমিতিতে শামিল হত, তখনই তলোয়ার ইত্যাদিতে সুসজ্জিত এক বেসরকারী সশস্ত্র-বাহিনী তাদের আক্রমণ করত। এদের পেছনে প্রেরণা দিত কারা—আন্দাজ করা কঠিন নয়, কিন্তু সরকার একেবারে নির্বিকার। অনেক সময় ঘোড়-সওয়ার পুলিশবাহিনী এদেরই সাহায্য করত। এমন কি সুভাষচন্দ্রের সভাতেও একবার এই রকম সশস্ত্র আক্রমণ চলেছিল।

অন্যদিকে হোমির বিরুদ্ধে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত ও অন্য নানারকম মামলা হয়। তাঁকে জেলে বন্ধ থাকতে হয় প্রায় সাত বছর। ফলে, ১৯৩২ নাগাদ লেবার অ্যাসোসিয়েশন প্রায় সাইনবোর্ড-সর্বস্ব, লেবার ফেডারেশন অত্যন্ত হীনবল, আর নাইডু নামে ভি ভি গিরির এক শিষ্য মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন খাড়া করে বিচ্ছেদবর্ধনে ব্রতী। শ্রমিকরা তখন সশস্ত্রবাহিনীর ভয়ে কোথাও একত্র জমা হতে সাহস করে না। প্রায় দুবছর জামশেদপুরে কোনো সভা-সমিতির অনুষ্ঠানই হয় না।

ওদিকে অর্থনৈতিক সংকটের অজুহাতে শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার ওপর কোম্পানির আক্রমণ দিন দিন তীব্রতর হতে থাকে—যার কিছুটা বর্ণনা পূর্বলিখিত স্মারকলিপিতে দেখা গেছে।

জামশেদপুরের আর এক বৈশিষ্ট্য যে টাটা কোম্পানি গোটা শহরের মালিক—বেশির ভাগ বাড়ি তাদের ভাড়া দেওয়া কোয়ার্টার আর লোকের নিজস্ব বাড়ির অস্তিত্বও তাদের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল। ফলে বেয়াড়া শ্রমিককে শুধু বরখাস্তই করা হত না, একেবারে গৃহহীন করে এলাকা থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া হত। শ্রমিকদের সমাবেশের কণ্ঠ যেমন রুদ্ধ, ঘরে ঘরে বা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে প্রচার করার বিপদও তেমনি ভয়ঙ্কর।

এইরকম সময় লেবার ফেডারেশনের খাজাঞ্চি সর্দার মঙ্গল সিং কলকাতায় আসেন এবং আমাদের পার্টির মোটর-শ্রমিক নেতা গেন্দা সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। হোমি তখন জেলে। ফেডারেশনের অফিস পর্যন্ত জামশেদপুর থেকে বহিষ্কৃত। টাকা-পয়সা আটক। শ্রমিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু তাহলেও লেবার অ্যাসোসিয়েশনের তুলনায় সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে—বিশেষ করে পাঞ্জাবী, আদিবাসী, ছত্রিশগড়িয়া ও হিন্দীভাষী শ্রমিকদের মধ্যে—ফেডারেশনের প্রতি মমতা ছিল অধিক। অবশ্য অনেকেই তা প্রকাশ করতে সাহস পেত না। আর সাধারণভাবে গত কয়েক বছরের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সমস্ত শ্রমিকের মনেই এক ব্যাপক হতাশা।

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তখন সবেমাত্র দুভাগ হয়েছে। একভাগে সুভাষবাবুরা (অবশ্য আমি ঠিক যে-সময়ের কথা বলছি, তখন সুভাষবাবু বিদেশে), আর একভাগে আমরা (পরে আমরা এই ভাগের নাম দিই রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস)। বঙ্কিম মুখার্জি এবং এস জি সরদেশাই আমাদের ভাগের জেনারেল সেক্রেটারি।

মঙ্গল সিং আমাদের কাছেই এলেন। বললেন, "আপনাদের জামশেদপুর যেতে হবে।" আমরা ভেবে দেখলাম, সোজাসুজি লেবার ফেডারেশনকে মদত দিতে গেলে হয়তো ঢুকতেই দেবে না। তাই স্থির হল, আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা হবে জামশেদপুরে। এবং তারই প্রস্তুতি হিসেবে এখন সেখানে টি ইউ সি-র কার্যকরী কমিটির সভা ডাকা হবে।

টি ইউ সি সভা

ডঃ ভূপেন দত্ত, বঙ্কিমবাবু, হালিম, আমি এবং আরও অনেকে ভোর রাত্রে জামশেদপুর পৌঁছলাম। বম্বে থেকে সরদেশাই, কুলকার্নি প্রমুখেরাও ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন। পৌঁছে দেখি, পুলিশের এলাহি ব্যবস্থা তো

আছেই, তার ওপর কোম্পানির লালমুখো সাহেবরা গরম ওভারকোট গায়ে দিয়ে স্টেশন পাহারায় নিযুক্ত—যেন আমরা বিদেশ থেকে আক্রমণ করতে এসেছি।

সময়টা বোধ হয় বত্রিশ সালের শেষ কিংবা তেত্রিশের শুরু। শীতের মধ্যে অন্ধকার-অন্ধকারেই স্টেশন থেকে শহরে পৌঁছে দেখি, একখানা প্রায় ছাদহীন সদ্য নির্মীয়মাণ বাড়ির এবড়োখেবড়ো মেঝেতে আমাদের আসন পাতা। মঙ্গল সিং জানালেন, টাটা কোম্পানির শাসানির ফলে কোনো হল বা কোনো বাড়িতে কেউ জায়গা দিতে সাহস করে নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বদেশবাসী এক পাঞ্জাবী কনট্রাকটরের আধা তৈরি বাড়িতেই আমাদের এনে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। না আছে আলো, না আছে পায়খানা। কিন্তু সবাই বলালাম কুছ পরোয়া নেহি। আবার সেই "দ লোদাস"।

কার্যকরী সমিতির সভার বিবরণ বিশেষ কিছু মনে নেই, তবে সেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে কয়েক মাসের মধ্যে জামশেদপুরে টি ইউ সি-র অধিবেশন হবে এবং সেজন্য মঙ্গল সিং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। টি ইউ সি-র দুজন জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন বঙ্কিমবাবু ও সরদেশাই। তদুপরি গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো তৃতীয় জেনারেল সেক্রেটারি নিয়োগ করা হয় আমাকে। সংগঠন যত বিভক্ত হয়, পদাধিকারীর সংখ্যা তত বাড়ে, এ তো স্বাভাবিক নিয়ম।

এল-টাউন ময়দানে প্রকাশ্য শ্রমিক সভা ডাকা হয়েছিল লেবার ফেডারেশনের নামে। ইতিমধ্যে শহরের অনেক পরিচিত-অপরিচিত লোক এসে সাবধান করে দিয়ে গিয়েছিলেন যে প্রকাশ্য সভা ডাকবেন না, খুনোখুনি রক্তারক্তি হয়ে যাবে। দু-বছরের মধ্যে যা কেউ সাহস করে নি, আপনারা তাই করবেন। আমাদেরও মনে মনে বেশ ভয় ভয় করছিল, কিন্তু চেপে গিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করলাম—দ লোদাস!

বহুকাল পরে

সভাস্থলে গিয়ে দেখি, একপাশে লাইন দিয়ে প্রায় শতখানেক সশস্ত্র ঘোড়-সওয়ার পুলিশ, ঘোড়ায় চড়ে স্বয়ং লালমুখো ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত। অপর দিকে আনাচে-কানাচে বেসরকারী অস্ত্রধারী। মঞ্চের চারপাশে দু-একশো লোক। আর মাঠের প্রান্তসীমায়, রাস্তার ধারে, গলিতে গলিতে অনেক মুখ উঁকি মারছে।

দুরু দুরু বুকে বলির পাঁঠার মতো আমরা নেতারা মঞ্চে গিয়ে বসলাম। মঙ্গল সিং দু-এক কথায় পরিচয় করে দেওয়ার পর উঠলেন বঙ্কিমবাবু। হাত দুটি পেছনদিকে জোড়া করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় আওয়াজের পর্দা চড়ালেন ধীরে ধীরে। পাঁচ-দশ মিনিটেও কোনো আক্রমণ হচ্ছে না দেখে শ্রোতারা মঞ্চের দিকে এগোতে শুরু করলেন। তখন বঙ্কিমবাবু ছাড়লেন এক মোক্ষম গল্প। বললেন, যাঁরা কোম্পানির দালালি করেন সেইসব ভাইদের আমি শুধু ধৈর্য ধরে একটি গল্প শোনার জন্য অনুরোধ করি, যথা :

এক চাষীর অনেকগুলি মুরগি ছিল। কিন্তু প্রায়ই শেয়ালে খেয়ে যেত। তখন সে একটা কুকুর পুষল, যাতে শেয়াল আসতে না পারে। মালিক কুকুরকে খুব তোয়াজ করে, ভালোমন্দ খাওয়ায় আর কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সারারাত শেয়ালকে আর এদিক মাড়াতেও দেয় না। মালিকের মুরগির সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলল, টাকা-পয়সা বেড়ে চলল, শ্রীবৃদ্ধির আর তুলনা রইল না। এমনই অনেক দিন যাওয়ার পর শেয়ালটা একদিন মরিয়া হয়ে চাষীর ঘরের কাছে গিয়ে উপস্থিত। এসে দেখে, সেই কুকুরটা একেবারে হাড়-জিরজিরে, বসে বসে ধুঁকছে, দেহে প্রাণ আছে বলেই যেন মনে হয় না। সাহস পেয়ে শেয়াল কুকুরকে প্রশ্ন করল, "ভাই, তোমার এ দশা কি করে হল ?" কুকুর বলল, "কি আর বলব ভাই, কিছুদিন পাহারা দেওয়ার পর মুরগি যখন আর মারাই পড়ে না, তখন থেকে মালিক আমাকে আর পোঁছেই না, খেতেও দেয় না, যত্নও করে না।" শেয়াল বলল, "ভাই, ঐ তো তুমি ভুল করেছ, এখন তুমি চুপচাপ থাকো, কিছুদিন আমি মুরগি খেয়ে যাই। তারপর দ্যাখো কি হয়।" কুকুর তাই করল।

একদিন, দুদিন, তিনদিন—রোজ মুরগি মারা যাচ্ছে। বাবুর হঠাৎ খেয়াল হল—আরে, সেই কুকুরটা কোথায় গেল ! খুঁজে দেখে, কুকুরের প্রায় খাবি খাওয়ার অবস্থা। তখন আবার আরম্ভ হল কুকুরের তোয়াজ।

এইবার গলা চড়িয়ে বঙ্কিমবাবু বললেন, "প্রিয় দালাল ভাইয়েরা, তোমাদেরও তো কোম্পানি এখন আর তোয়াজ করে না। দু-বছর আমাদের একটা সভাও তো করতে দাও নি। এরপর আর তোমাদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে গুনবে কেন ? তার চেয়ে তোমরা আমাদের সঙ্গে ভেড়ো অথবা সরে থাকো—আমরা সভা করি আর তোমাদেরও কদর বাড়ুক।"

হাসি-হল্লায় মাঠ ফেটে গেল ও চারদিক থেকে লোক এসে বহুদিনের

ফাঁকা মাঠকে প্রাণবন্ত করে তুলল। শ্রমিকদের মুখে হাসি আর ধরে না। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল টি ইউ সি-র কি ক্ষমতা।

উৎসাহিত হয়ে পরের দিনও সভা ডাকা হল এবং সেদিন সারা জামশেদপুরই বুঝি ভেঙে পড়ল এল-টাউনের ময়দানে।

জামশেদপুরের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পার্টি হুকুম দিল, মাসে অন্তত আট-দশদিন ওখানে থেকে লেবার ফেডারেশনকে দাঁড় করাতে সাহায্য করতে হবে। পার্টিতে তখন সক্রিয় টি ইউ-কর্মী মাত্র দুজন—আমি আর অবনী চৌধুরী। অবনীও মাঝে মাঝে এসে আমাকে সাহায্য করবে ঠিক হল।

কিন্তু জামশেদপুরে গিয়ে থাকব কোথায়? কমরেড মোমিনের পালক-পিতা ব্রজেনবাবু তাঁর অনুগত এক ভদ্রলোককে চিঠি লিখে দিলেন আমাদের সাহায্য করার জন্য।

ভোরবেলা টাটানগর পৌঁছে আমি আর অবনী দুজনে ভদ্রলোককে বিছানা থেকে টেনে তুললাম। তিনি ব্রজেনবাবুর খুব ভক্ত, তবু নিজের বাসায় ঠাঁই দিতে সাহস করলেন না। কাছাকাছি একটা মেসে তাঁর বন্ধুদের কাছে তুলে দিলেন।

সেখানে বিছানাপত্র রেখে নিকটে সেনবাবুর হোটেলে চা খেতে খেতে সেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল। তিনিও এককালে শ্রমিক আন্দোলন করেছেন, আমাদের সম্বন্ধে সবই জানেন। বললেন, "মেসে কদিন থাকতে পারবেন জানি না, জায়গা না পেলে আমার হোটেলে চলে আসবেন।"

হলও তাই। মেসের সবাই টাটার কর্মচারী, দুপুরের মধ্যে এমন তাড়া খেল যে হাত জোড় করে দুজনকে বলল পথ দেখতে। অগত্যা সেনের হোটেলে। সেনবাবু কর্মচারী নন, তাছাড়া কিছু সাহসও আছে মনে হল—তিনি আমাদের স্থান দিলেন।

লেবার ফেডারেশনের অফিস কিন্তু অনেক দূরে, টাটার এলাকার বাইরে জুগ্‌সেলাই নামে জায়গায়। কোম্পানির সুনজরের ফলে তারও এই দশা। যদিও ১৪৪ ধারা নেই, তা হলেও নন-রেগুলেটেড জেলা হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় যা খুশি তাই করতে পারেন। সুতরাং তাঁর অনুমতি ছাড়া জনসভা ডাকা চলবে না। যাই হোক, অনুমতি নিয়েই আমরা আরও কয়েকটা জনসভা করলাম, গেটে বসিয়ে চাঁদা আদায় করলাম, শ্রমিকদের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎও করতে লাগলাম।

মঙ্গল সিং

এই সময়েই দেখতে পেলাম কী আন্তরিকতাপূর্ণ জনপ্রিয় ও অক্লান্ত কর্মী মঙ্গল সিং, কী দুর্দান্ত তাঁর বুকের পাটা। ইউনিয়ন করার জন্য কাজ তো খুইয়েছেনই, সশস্ত্র দালালদের হাতে কতবার যে নিগৃহীত হয়েছেন তারও ইয়ত্তা নেই। তবু নির্ভয়ে শুধু আমাকে নিয়ে মাইনের কদিন সারা বেলা বসতেন গেটের ধারে, লম্বা ভারী কৃপাণখানা খুলে রাখতেন ডানহাতের কাছে, আর অভাব-অভিযোগ নিয়ে পরামর্শ দিতেন শত শত মজুরকে। শ্রমিকরা এত ভালোবাসত যে ফেডারেশনের চাঁদা তো নিতই, তার ওপর আরও কিছু গুঁজে দিত মঙ্গল সিংয়ের পাগড়িতে—নইলে এই নিগৃহীত মানুষটা সপরিবারে চালাবে কি করে।

সহানুভূতি থাকলেও ব্যাপক সন্ত্রাসের তাড়নায় কোনো শ্রমিকই প্রকাশ্যে ফেডারেশনের সংগঠক হতে ভরসা পেত না—মঙ্গল সিং প্রায় একাই সব কাজ করতেন। প্রতিপক্ষরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। প্রতিদ্বন্দ্বী লেবর অ্যাসোসিয়েশনের নেতা মণি ঘোষ এম পি ঐ সময় তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :

"Mangal Singh (Treasurer of Federation) kept the Federation going and he was subjected to inhuman tyranny."

যাই হোক, ক্রমে ক্রমে ফেডারেশনের অবস্থা কিছুটা ফিরল। শ্রমিকরা দলে দলে সেনের হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করত, কারণ জুগ্‌সেলাই-এর ইউনিয়ন অফিস অনেক দূর। ঐ হোটেলেই 'এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া'-র জীবনবীমার প্রধান প্রাদেশিক সংগঠকও এসে থাকতেন। আমার কাছে এত লোক আসছে দেখে তিনি হঠাৎ একদিন আমাকে ধরে বসলেন যে জামশেদপুরে তাঁর কোম্পানির প্রধান সংগঠক হতে হবে। আমি অবশ্য অনেক কাকুতি মিনতি করে তার সাধারণ এজেন্ট হয়েই কোনোরকমে রেহাই পেলাম।

শেঠি সাহেব

ফেডারেশনের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বন্ধু-শক্তিও খুঁজে বেড়াতাম। প্রথমেই পেলাম শেঠি সাহেবকে। জামশেদপুরে লেবার অ্যাসোসিয়েশনের গোড়াপত্তনের সময়েই ইনি ছিলেন তার জয়েণ্ট সেক্রেটারি। ইউনিয়ন করার অপরাধে বহুদিন কর্মচ্যুত হয়ে থাকেন, এমন কি গান্ধীজীও তাঁকে পুনর্নিযুক্ত করাতে পারেননি নি। লেবার অ্যাসোসিয়েশনের

প্রতিনিধি রূপে তিনি জেনেভায় আই এল ও সম্মেলনে গিয়েছিলেন এবং সেই উপলক্ষে সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়নও ঘুরে এসেছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি চাকরি ফিরে পান এবং তখন থেকে তাঁর প্রত্যক্ষ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

একদিন তিনি বঙ্কিমবাবুকে ও আমাকে তাঁর বাসায় আমন্ত্রণ করেন, ইউনিয়ন চালানোর ব্যাপারে অনেক সৎ পরামর্শ দেন এবং বলেন যে রুশদেশে শ্রমিকদের অগ্রগতির পর শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর গান্ধীবাদী ধ্যান-ধারণা একেবারে বদলে গেছে। তিনি বলেন; "আমি চাই এ দেশের শ্রমিকও রুশ শ্রমিকের মতো এগিয়ে যাক। তবে এখন প্রৌঢ় বয়সে আমি আর চাকরি যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারছি না। তাহলেও আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করব।"

তিনি আমাদের পরামর্শ তো দিতেনই, আর্থিক সাহায্যও করতেন।

লেবার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও আমি বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা করি। তাঁদের অবশ্য টাটার কোয়ার্টারেই ভালো রকম অফিস ছিল। কিন্তু কর্মতৎপরতা প্রায় কিছুই ছিল না। সভা-সমিতিও করতেন না, গেটে গিয়ে চাঁদাও তুলতেন না। তবে সম্পাদক মাইকেল জন যিনি শ্রমিক আন্দোলন করার অপরাধে কর্মচ্যুত—তাঁর সঙ্গে প্রায়ই তাঁদের অফিসে দেখা হত। লেবার ফেডারেশরে প্রতি বিরাগবশত প্রথম প্রথম তিনি মিশতে ইতস্তত করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায়, তাকে ঘনিষ্ঠতাই বলা চলে। তাহলেও আমাদের সঙ্গে একযোগে কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর সবচেয়ে বাধা ছিল ব্যাপক হতাশা। তখনকার অবস্থায় স্থানীয় চেষ্টায় শ্রমিক আন্দোলনকে আবার জাগানো যাবে তার ভরসা কোথায়? বাইরে থেকে কোনো বিরাট পুরুষ (অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র) এসে পেছনে না দাঁড়ালে কিছু করা যাবে না—এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। কিন্তু তিনি তখন ভিয়েনায়। সুতরাং হা হতোস্মি!

গল্প নয়, সত্যি!

এখন শুনলে হয়তো কেউ বিশ্বাস করবেন না, তবু এ কথা যে ক্রমে ক্রমে জন আমার সঙ্গে সমাজতন্ত্র তথা মার্কসবাদ নিয়েও আলোচনা করতেন। কিন্তু তাঁর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, কোনো বইও পড়েন নি। বিলেতে যেমন সকলে ভোট দিয়ে যাকে ইচ্ছে সরকারে পাঠাতে পারে, লেবার পার্টিকেও ক্ষমতায় এনে থাকে—তাঁর ধারণায় এই রকম রাষ্ট্রই বুঝি গণতন্ত্রের

পরাকাষ্ঠা। আমি বলি, "আপনি লেনিনের 'স্টেট অ্যাণ্ড রেভলুশন' (বছর-খানেক আগে আমি বইটির বাঙলা অনুবাদ বার করেছিলাম) পড়ুন, তাহলে রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, বিপ্লব সম্পর্কে আপনার ধারণা কিছুটা পরিষ্কার হতে পারে।" তিনি খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু বলেন যে, এসব বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু বোঝেন না, তাই আমার কাছে ক্লাস করতে চান। কংগ্রেস রাজত্বকালে জামশেদপুরের আই এন টি ইউ সি নেতারূপে জনের ভূমিকার কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা আজ শুনলে হয়ত অবাক হয়ে যাবেন যে তিনি বেশ কিছুদিন নিয়মিতভাবে আমার সঙ্গে পড়াশোনা করেন। এবং পড়াশোনা গোপন স্থানে গোপনে, কারণ লেবার অ্যাসোসিয়েশনের অন্য নেতারা জানলে অসুবিধে হবে বলে তাঁর ভয় ছিল।

এদিকে আমাদের সংগঠনের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি দেখে তার বিরুদ্ধে আঘাত আসা শুরু হয়। প্রথমে ফেডারেশনেরই একজন ছোট নেতা সম্ভবত কোম্পানির প্ররোচনায় আলাদাভাবে শ্রমিকদের সভা ডাকে। কিন্তু তাতে প্রায় কোনো শ্রমিকই সাড়া দেয় নি। বরং আমাদের সভার জনসমাগম আরো বাড়ে। তখন কোম্পানির সাহায্যে নামে সরকার—সভার অনুমতি আর মেলেই না। অবস্থা দেখে আমরা স্থির করলাম, মহম্মদই আরো ঘন ঘন পর্বতের কাছে যাবে। অর্থাৎ শহরের দূর দূরাঞ্চলের কোয়ার্টার ও বস্তি, যেখানে আদিবাসী, ছত্রিশগড়িয়া ও পাঞ্জাবীদের আধিক্য এবং যাদের মধ্যে লেবার ফেডারেশনের সমর্থন সর্বাধিক, আমরা সেখানেই বেশি করে যোগাযোগ শুরু করলাম।

প্রকৃতির সন্তান আর সভ্যতা

ভোরবেলা আমি আর মঙ্গল সিং পাহারাদার টিকটিকির চোখে ধুলো দিয়ে চলে যেতাম হয়ত সেই সুদূর সোনারি অঞ্চলে। এ এলাকা টাটার কোয়ার্টার অঞ্চলের বাইরে। মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় অঞ্চলের আধা জংলী মানুষেরা সভ্যতার তাড়নায় অন্নহারা হয়ে এই সুদূর কারখানায় দাস-জীবনের শৃঙ্খলে তাদের আদিম স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, মরেও মরে নি। কারখানার সারা দিনব্যাপী বিকট গর্জন, জ্বলন্ত স্ল্যাগের ভাস্বর দীপ্তির প্রখরতা, বেসিমার কনভার্টারের নীলাভ দ্যুতি এবং শিল্পনগরীর আরো অনেক কিছুর তীব্রতা থেকে খানিকটা দূরে শাল-মহুয়ার ছায়ায় তারা মাঝে মাঝে ডেরা বেঁধেছে, মহুয়া ফুলের মদির

নেশায় উচ্ছল রক্তস্রোতে অনুভব করেছে তাদের ফেলে-আসা বনভূমির চকিত স্মৃতি।

গায়ে গায়ে লাগানো একটা পূর্ণ বৃত্তের মতো তাদের বসতি। বৃত্তের ভেতর দিকটা বারোয়ারি, এক এক ঘরে হয়ত এক ড°ওকা (পুরুষ) আর তিন চার ড°ওকি (নারী)। পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই বেশি সংখ্যায় কারখানায় রেজা-কুলির কাজ করে।

সকালবেলায় আমরা যখন যাই, তখন যারা সকালের শিফটে কাজে যাওয়ার, তারা চলে গেছে। যারা অন্য শিফটের বা যারা কাজ করে না, তারা ঘরে আছে। ড°ওকা হয়ত মহুয়ার মদ খেয়ে তখনো ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আমরা যেতেই সবাই হাজির। কারণ আমরা যে ফেডারেশনের লোক। বৃত্তের মাঝখানে বসিয়ে চা ও ফুলুরি দিয়ে আপ্যায়ন। একটুখানি মহুয়া চলবে না কি?

আমরা বলি, "ঢোল নিয়ে এসো, সারা সোনারি মহল্লা ঘুরে ঘুরে ঢোল পেটাও, বিকেলে মিটিং হবে—যেখানে কোম্পানির সিনেমা দেখানোর জন্য দেয়াল বানানো আছে, সেখানে।" এইভাবেই সভার জন্য সরকারী অনুমতিকে আমরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতাম।

দুপুরে কেউ খেতে নেমন্তন্ন করত কিংবা এক বস্তি থেকে আরেক বস্তি যেতে হাঁড়িয়ার দোকানের কাছে এসে মঙ্গল সিং বলতেন, "আপনি একটু এগিয়ে গাছের নিচে বিশ্রাম করুন।" কিছুক্ষণ পর গোঁফ মুছতে মুছতে আমার জন্য একঠোঙা খাবার নিয়ে হাজির হতেন। ইতিমধ্যে কাছাকাছি সব বস্তিতেই অভিযোগ শোনা, দরখাস্ত লেখা, চাঁদা আদায় ইত্যাদি সেরে নিয়েছি; বিকেলে সভা, তার পরেই কালো কালো পাথরের মতন নিটোল দেহ রেজা-যুবতীদের দল, চুড়ো করে চুল বাঁধা, কানে ঝুলছে শিরীষ ফুলের ঝুমকো, মাদলের তালে তালে আবছা অন্ধকারের সন্ধ্যে যেন জ্যোৎস্নায় মুখর হয়ে উঠত।

ফেডারেশন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। অনেক অনুরোধ-উপরোধ ও আইনের ধমকাধমকির পর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে একটা কেন্দ্রীয় সভার অনুমতি আদায় করেছিলাম। সেটা আগের চেয়েও বড় হল। আরও আশ্চর্য, সভার খবর বেরিয়ে গেল বোম্বাই-এর 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' কাগজে পর্যন্ত। পরের দিন শেঠি সাহেব গোপনে গোপনে বললেন যে সভায়

জমায়েতের খবর পড়ে নাকি বোম্বাই শেয়ার বাজারে টাটার শেয়ারের দাম একটু পড়ে গেছে। পরামর্শ দিলেন চালিয়ে যান, কোম্পানি এবার ভয় পেয়েছে।

ধনবাদের স্বাদ

কিন্তু কোম্পানির ভয়ের পরিচয় যেভাবে পেলাম তা খুব সুখকর নয়। অবনী আর আমি একদিন বিষ্টুপুরের রাস্তা দিয়ে চলেছি, কোনোখানে কিছু নেই, হঠাৎ দুজন পাঠান হাতে মোটা বেত নিয়ে আমাকে আক্রমণ করল। পিঠ একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অবশ্য ভিড় জমে গেল, সকলে মিলে একজনকে ধরে ফেললাম। আরেকজন পালিয়ে গেল। গুণ্ডাটাকে ধরে থানায় নিয়ে যেতে দারোগাবাবু আমার পিঠের শার্ট না তুলেই বললেন—"কই, কিছু লাগেনি তো! এর কোনো কেস নেওয়া যাবে না।" গুণ্ডাটা অনায়াসে সরে পড়ল।

এর পর থেকে মঙ্গল সিং আমাকে আর একা কোথাও যেতে দিতেন না। তাঁর কৃপাণ সঙ্গে নিয়ে সর্বদা আমাকে পাহারা দিয়ে চলতেন।

জনের সঙ্গে আমার ঘন ঘন দেখা হত বলে মালিকরা হয়ত ভাবত যে তাঁরাও আমাদের সঙ্গে আসছেন। আমি মার খাওয়ার কিছুদিন পরে একদিন জনের অফিসেই গুণ্ডার হামলায় জন বেচারী বেশ আহত হলেন।

শুধু মালিকরা নয়, সরকারও তখন আক্রমণের জন্য কোমর বেঁধেছে। তারা যে কোনো জায়গায় সমস্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। আর বস্তিতে গেলেই পেছনে এমন ফেউ লাগত যে লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করাই কঠিন।

ঠিক করলাম, সভা যখন করতে পারছি না, তখন একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের করে প্রচার চালাতে হবে। জামশেদপুরে কাগজের ডিক্লারেশন পেলাম না। গেলাম জেলা সদর চাইবাসায়, সেখানেও বিফল মনোরথ।

তখন কলকাতা থেকে কমরেড ধরমবীর সিংকে (ইনি গোয়ানিজ, দিল্লি থেকে এসে আমাদের পার্টিতে যোগ দেন—এখন কোঙ্কন এলাকায় সি পি এম-এর নেতা) লেবার ফেডারেশনের জুগ্‌সেলাই অফিসে বসিয়ে দিলাম। আমি চলে গেলাম কলকাতায়, সেখান থেকে কাগজ বের করে জামশেদপুরে পাঠাব।

'জঙ্গী মজদুর' কাগজ

বেরুল হিন্দি 'জঙ্গী মজদুর'। তার হিন্দি হত অপূর্ব, কারণ বেশিরভাগই আমার ভাঙা হিন্দি থেকে ছাপাখানাওয়ালা লিখে নিয়ে ছাপত। কিন্তু হিন্দিতে কি আসে যায়, শ্রমিকদের লড়াইয়ের খবর তো ঠিক আছে, লেবার ফেডারেশনের নামও আছে। সুতরাং কাগজ নিয়ে একেবারে কাড়াকাড়ি।

কিন্তু বিধি অর্থাৎ সরকার বাম, সম্ভবত টাটার চাপে এবং জামশেদপুরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তাগাদায় বাঙলা সরকার এই কাগজের ওপর জামিন দাবি করল, যদিও বাঙলাদেশ সম্পর্কে এতে বিশেষ কিছু লেখাই হত না। ফল—কাগজ বন্ধ।

তারপর কোম্পানি এক মানহানির মামলা দায়ের করলেন—আসামী আমি, বঙ্কিমবাবু, ধরমবীর ও মঙ্গল সিং—অভিযোগ, এই কজনের নামে এক ইশতেহারে নাকি টাটা কারখানায় কাজের চাপের জন্য দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে বলে লেখা হয়েছে। অবশ্য, মামলায় আমি আর বঙ্কিমবাবু প্রথমেই খালাস পেয়ে গেলাম, অন্য দুজনের অর্থদণ্ড হল। কিন্তু খালাস পেলে কি হবে? মামলার সময় এসে সেনের হোটেলে উঠেছিলাম। সেন মশায় হঠাৎ একদিন জোড়হাত করে বললেন, "আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে আপনাকে এখানে থাকতে দিলে হোটেল আর থাকবে না।" কিছু বলার নেই, কারণ সেনবাবু এতদিন যথাসাধ্য করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জুগ্‌সেলাইয়ে ফেডারেশন অফিসে স্থান নিলাম, যদিও সেখানে জল পায়খানা ইত্যাদি কোনো কিছুরই ব্যবস্থা নেই।

কলকাতা ফেরার আগে অন্তত ঘনিষ্ঠ শ্রমিকদের সঙ্গে অবস্থাটা আলোচনা করে যাওয়া দরকার। সেরকম শ্রমিকের সংখ্যাও প্রায় চার-পাঁচশো। জুগ্‌সেলাই অফিসে বিশ-পঁচিশ জনের বেশি লোক ধরে না। কি করা যায়? আবার সেনবাবুর শরণ নিলাম। তাঁর হোটেলের কাছে অনেকদিনের একটা পাবলিক লাইব্রেরি ছিল, যার তিনিও কর্মকর্তা. সেই লাইব্রেরির সম্পাদককে বলে তাঁদের হলে সভার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কার্ড দিয়ে বাছা বাছা কয়েকশো শ্রমিককে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সভার সময়ে গিয়ে দেখি, লাইব্রেরি হল তালাবন্ধ। শ্রমিক অনেকে এসে জমা হয়েছেন। হঠাৎ লাইব্রেরি সম্পাদক এসে একটি চিঠি ধরিয়ে দিলেন। তাতে অবশ্য লেখা আছে—অনিবার্য কারণে হল দেওয়া সম্ভব হল না, তবে মুখে

বুঝিয়ে দিলেন, হল দিলে তাঁকে আর কষ্ট করে কোম্পানিতে চাকরি করতে হবে না।

কি করা যায় পরামর্শ করার জন্য কলকাতায় ফিরলাম। কিন্তু পরামর্শ আর করতে হল না। সরকারী হুকুম এসে গেল—জামশেদপুরে প্রবেশ নিষেধ। কিছুদিন পর একই হুকুমের ধাক্কায় ধরমবীর ও মঙ্গল সিং-কেও স্থানচ্যুত হতে হল।

জামশেদপুরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হল। অর্থনৈতিক সঙ্কটের কঠোর যুগে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী ধনবাদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে যে বন্ধুর পথে চলতে হয়েছিল, সে পথ শুধু অভ্যুদয়ই নয়, অনেক পতন দ্বারাও চিহ্নিত। কিন্তু তা বৃথা নয়। সেদিনের প্রতিটি নিষ্ঠুর আঘাত জামশেদপুরের শ্রমিকশ্রেণীকে শুধু যন্ত্রণাই দেয় নি, শ্রমিক আন্দোলনের রূঢ় বাস্তবতাকেও তাদের চোখের সামনে তুলে ধরে চেতনার প্রসার ঘটিয়েছিল, সযত্নে রক্ষা করেছিল উপলব্ধির সেই দুর্বল অঙ্কুরটিকে, যা আবার নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে একসময় কমিউনিস্টদেরই বসিয়েছিল জামশেদপুরের শ্রমিক আন্দোলনের শীর্ষস্থানে।

সেদিনের সাময়িক পিছুহটা সত্ত্বেও আজ যখন আধা-অস্পষ্ট পুরোনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে, তখন ভাবি, কি সৌভাগ্যবান আমি যে অত অল্প বয়সে এতবড় একটা বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পেরেছিলাম, তাদের সুখ-দুঃখ, শক্তি ও দুর্বলতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে কয়েক ঋতুর মধ্যে আমার চেতনাকে কয়েক বছর এগিয়ে নিতে পেরেছিলাম। কি সৌভাগ্য আমার যে, মঙ্গল সিং-এর মতো বীর শ্রমিক আর শিশুর মতো সরল আদিবাসীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলাম, ভারতের প্রায় সমস্ত দেশের শ্রমিককে একসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, আনন্দদায়ক অগ্রগতি আর তার চেয়েও গৌরবময় ভয়হীন পশ্চাদ্‌বর্তন থেকে এমন পাথেয় যোগাড় করেছিলাম যা উত্তরকালে অনেক জয়যাত্রারই প্রেরণাস্বরূপ।

দিলীপ বসু

শার্লক হোমস থেকে মার্কসীয় দর্শন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, দাবার চাল থেকে মহাকাশ পরিক্রমা অবধি যার আগ্রহের বিস্তার, সেই দিলীপকে যখন একদিন প্রশ্ন করা হয়েছিল—তুমি পার্টিতে এলে কি করে? তখন তৎক্ষণাৎ সে জবাব দিয়েছিল 'I drove into the party।' ১৯৩৯-৪১ সালে নিষিদ্ধ সাম্যবাদী দলের কাজে মোটর গাড়ির ড্রাইভারী করেই নাকি সে পার্টিতে ঢুকেছে!

দূরকে নিকট বন্ধু, পরকে ভাই করার ক্ষমতাও ছিল তার অপরিসীম। সাত বছরে বিলেতে সে ঘনিষ্ঠ হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের শুধু বহু নেতাদের নয়, অসংখ্য সাধারণ সদস্যদেরও—বিখ্যাত R. P. D-র তো সে ছিল প্রায় ভারতীয় সেক্রেটারি, লণ্ডনে Paul Robeson-এর বক্তৃতা ও গানের সভায় সে সভাপতি। ইয়োরোপের নানা দেশে যুব আন্দোলনের ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে সে ভাব করেছে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নওজোয়ানদের সঙ্গে, আবার তাদের সঙ্গেই অফুরন্ত গল্প করতে করতে বিখ্যাত Trans-Siberian রেলপথে সে ১০ দিন ধরে পাড়ি দিয়েছে সাইবেরিয়ার বুকের উপর দিয়ে। আর আমাদের এই বিরাট দেশেও সে ঘুরেছে সর্বত্র—শেষের ক'বছর পাঞ্জাব, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ থেকে ভুবনেশ্বর, কলকাতা, গোহাটি অবধি ছুটাছুটি করেছে পার্টি ক্লাস নেওয়া ও তার বন্দোবস্ত পাকা করার জন্য। আবার তারই মধ্যে একবার সে হঠাৎ গুজরাট ঘুরে এল গান্ধীজীর কাথিয়াওয়াড় ভালো করে দেখার জন্য।

আর ঐ সব বিচিত্র বিষয়ে ও বিচিত্র মানুষ নিয়ে অবিশ্রাম গল্প করতে দিলীপের জুড়ি ছিল না। সেটা বাচালতা নয়, তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সহৃদয়তার উচ্ছল প্রকাশ। যতদিন কিছুটা সচল ছিলাম, দিলীপ কলকাতায় ফিরেছে শুনলেই আমি পরদিনই দৌড়তাম তার বাড়ি শুধু তার গল্প শোনার জন্যই। শুধু আমি নয়, তার গল্পের আসর পাতা ছিল সর্বত্র আর তাই তার বন্ধুভাগ্যও সীমাহীন। দিলীপের সেই বিখ্যাত গাড়ির

কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। অনেকেই হয়তো তাতে চড়েছেন। চিদানন্দ দাশগুপ্তের 'বিলেত ফেরৎ' ফিল্মেও বোধ হয় সেটি দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি দিলীপ তার সেই খেলাগাড়িতে জনা সাত আটেক বাচ্চাকে পুরে মহানন্দে চলেছে তাদের আইসক্রীম খাওয়াতে। তাদের সবাইকে সকাল বেলা বাড়িতে এনে সারা দিন খাইয়ে দাইয়ে, অজস্র গল্প করে আর তারপর সন্ধেবেলা আইসক্রীম খাইয়ে বাড়ি বাড়ি তাদের পৌঁছে তবে তার ছুটি। সারাদিন তাদের সঙ্গে দিলীপ কি গল্প করত কে জানে? নিশ্চয়ই আপেক্ষিক তত্ত্ব নয়। শুধু এটা জানি যে তাদের চোখে দিলীপ কাকা বা দিলীপমামা অদ্বিতীয়।

আবার ঐ গাড়িতেই দেখেছি দিলীপ দিনরাত ড্রাইভারি করছে লাহিড়ীকে তিন তিনবার নির্বাচনে জেতানোর জন্য। ১৯৬১ সালে দেখেছি তিন সুন্দরীকে নিয়ে রবীন্দ্রমেলার জন্য টাকা ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে দপ্তরে দপ্তরে ও বাড়ি বাড়ি ঘুরতে; শান্তি আন্দোলনের রমেশচন্দ্র ও পেরিন, ISCUS-এর লিটো ঘোষ এবং অসংখ্য কর্মী সবাই চড়েছেন দিলীপের সেই আশ্চর্য বাহনে, মায় জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী জে, ডি, বার্নাল ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু আর দুই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও ওঙ্কার নাথ ঠাকুর পর্যন্ত।

আর এঁদের নিয়ে দিলীপ যখন গাড়ি চালাত তখন তার মুখ যে বন্ধ থাকত না—তা বলাই বাহুল্য। নিপুণ, অভিজ্ঞ মোটরচালক তখন মাঝে মাঝে আলাপে মেতে উত্তেজনায় Steering wheel ছেড়ে হাততালি দিয়ে উঠত আর বারবার ফিরে ফিরে কথা বলত পিছনকার seat-এর যাত্রীদের সঙ্গে। অমন বিপাকে পড়ে সন্ত্রস্ত অধ্যাপক সুশোভন সরকার নাকি একবার দিলীপের সব বক্তব্যই মেনে নিয়েছিলেন বিনা বাক্যব্যয়ে।

আসলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে ঐ মনীষীরা পর্যন্ত সবারই বন্ধু ছিল দিলীপ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনীষায় আসতেন মাঝে মাঝে। দিলীপ তাঁকে খাওয়াত মির্জাপুর স্ট্রিটের তেলেভাজা আর কফি হাউসের Black Coffee—সুনীতিকুমারের ভাষায় Black as sin! তারপর তাঁর আর গোপালদার সঙ্গে (কখনো কখনো সেখানে হিরণকুমার সান্যাল থাকতেন) তার আলাপ চলত ভাষাতত্ত্ব নয়, কোথায় কোন সুখাদ্য পাওয়া যায় তাই নিয়ে। আমাদের মধ্যে সেই ছিল ও-বিষয়ে সেরা সমঝদার।

কলকাতায় দিলীপের দরবার সকালে বসত তার বাড়িতে আর বিকেল

ক্ষেতজননী

অশোককুমার সেনগুপ্ত

বার বিঘে সরস ধানি জমি, নদীর চড়ায় দেড় বিঘে তড়ি অর্থাৎ আখ আলু, বেগুন, মুলো, কপি এবং রবিশস্যের চাষযোগ্য নধর ভুঁই এবারের ফলনে ফটিক মণ্ডলের খড়ের চালকে ঝকঝকে করগেট শিটের রুপোলি মুকুট পরিয়ে দেয়। বড়ছেলে চন্দ্রনাথ বেসিক ট্রেনিং নিয়ে এক বছরের মাথায় প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি জুটিয়ে ফেলে। সাইকেলে পঁচিশ মিনিটের রাস্তা—দূর গাঁও নয়। মেয়ে কাজলা দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক পাস করে। আর দুই ছেলেমেয়ে সূর্য এবং চঞ্চলা পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ফাস্ট' এবং থার্ড' হয়ে ওঠে। এক সঙ্গে দুটো গাই রকনা বিইয়ে দেয়। দু'হাজার টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ পায়। পঞ্চায়েত সদস্য হলধর ডেকে চার কেজি সরষের মিনিকিট দেয়। কলকাতাবাসী দাদা দু'বিঘে সরেস জমি সস্তা দরে তাকেই বেচে। সাড়ে চারশ টাকায় কেনা দামড়াজোড়া এ বছর অন্তত বারশ টাকার বলদ হয়ে জমি চষে।

এরকম একগুচ্ছ সৌভাগ্যের মূলকেন্দ্রের দিকে ফটিক মণ্ডল ধাবিত হয়ে যখন আবিষ্কার করে নিজের বুদ্ধি এবং বিশালকায় আত্মঅস্তিত্বকে, তখন একটা ধারাল সংবাদ অট্টহাসির মতো আছড়ে পড়ে। যা অবিশ্বাস্য। চমৎকার আঁটবাঁধুনির গেরস্তঘরের শক্ত দড়ি এবং খুঁটি দিয়ে বাঁধা বেড়াটা যেন শিঙে গুঁতিয়ে ঢুকে পড়ে একটা জীব। ফটিক মণ্ডলের ঐ উপমাই মনে হয়। শোনামাত্র গিরিচূড়া স্খলিত হওয়ার মতো পতনের শব্দ এবং ধুলোর ঝড়ের বিপন্নতা কেটে যেতে ক্রোধ এবং আনুষঙ্গিক ওরকম ভাবনায় তার বাহান্ন বছরের রোগা দেহটা ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। শিরাপথে

রক্তধারা থমকে যায়। এবং শ্বাসক্রিয়ার জরুরি ব্যবস্থাটাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তার গেরস্ত সত্তার গায়ে বর্গাদার নামের লাল টকটকে আঁচটা লাগবে আদপেই ভাবনার কোনো অব্যবহৃত কক্ষে পর্যন্ত ছিল না।

গ্রামের আবহাওয়ায় ঢের নতুন হাওয়া। আটষট্টিতে যুক্তফ্রন্ট, একাত্তরে নকশাল, তারপর জরুরি অবস্থা, অঞ্চল থেকে গ্রামপঞ্চায়েত, ভোটাভুটি, মিছিল, পাড়ায় পাড়ায় চরম উত্তেজনা, বর্গা অপারেশান। পাক খাচ্ছে কোথাও ঘূর্ণি হয়ে কোথাও-বা ঝড়। বর্গা করে সাগর হাড়ী চক্রবর্তীর বড়বিটির বিয়েতে নগদ হাজার টাকা নিয়ে জমি ছাড়ল, ক'দিন দেদার খরচা করে তারপর কাঠ উপোস। চারবিঘে জমি ঘোষবাবু বিক্রি করতে এসে দশ কাঠা দিয়ে দিল বলাইকে, 'সই দে বাপ, জমি ছাড়।' ভোটভোট বচসায় সন্ধেবেলায় কানু গুপ্ত লাঠির ঘায়ে পাকা তিনমাস হাসপাতাল, 'কর শালা ভোট'। পঞ্চায়েত সদস্য হলধর ফুড ফর ওয়ার্কাস, ডি আর পি, পুকুর কাটা ইত্যাদি ইত্যাদিতে ফুলে ফেঁপে ঢোল। দেওয়ালে পোস্টার পড়ল, 'চোরা হলধর, সাবধান।' ধরমপুজোয় দু'পাড়ার তুমুল লাঠালাঠি। পুলিশ, নেতা সামাল সামাল। বেনামী জমি, ভেস্ট জমি নিয়ে দারুণ হুড়োহুড়ি।

কিন্তু হাওয়া ফটিক মণ্ডলের উপর শান্ত, নিয়ন্ত্রিত। সে কোনো কিছুতেই নেই। কিংবা হাঁস—জলে দিব্যি ভাসে। সে বাঘনই গাঁয়ের বাইরে এক পা বাড়ায় নি। চাষ ছাড়া অন্য কর্মও না। বাপ ঠাকুরদার জমি জিরেত স্বহস্তে চষে এসেছে। বছর ছয়েক আগে বুধের বাপ কেষ্টকে সে কিষান রাখে। পেটের রোগে কাহিল হয়ে পড়েই লাঙলের বোঁটা ছাড়তে হয়। তা কেষ্ট দু'বছর চষে সাপে কাটতে বুধে লাগল। উৎপাদন ঘরে মোটামুটি স্বচ্ছলতার দীপ্তি ছড়িয়ে রাখে। অসুখবিসুখ কিংবা শরিকিভাগের বিবাদ, পড়শির ঝামেলা অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা চরম কিছু নয়। বস্তুত তার মাটির দোতলা, ওদিকে রান্নাঘর, গোয়াল উঠোন যেন দ্বীপের মতো এক অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দিন এবং রাত্রিকে নামায় এবং তুলে নেয়। এই দ্বীপ গড়ে তোলার জন্যে চতুর্দিকে যে জলের বেষ্টনী সেটা তার সুবাক্যের ব্যবহার, ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা, বাইরের ঝামেলায় কোনো মন্তব্য প্রকাশ না করা এবং ভেতরের ক্রোধকে অপ্রকাশিত রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু মানবিক গুণ। ফটিক মণ্ডল সৌভাগ্যবান, এ ধরনের গুণাবলী প্লাবনকে প্রতিহত করতে পারে না কিন্তু। তার চার সন্তানের গর্ভধারিণী জ্যোৎস্নাময়ী অবশ্য বলে, ভোঁদড়।

বৈশাখের তীব্র দহনে উঠোনের মাটি জ্বলন্ত উনুনের পার্শ্বতল। পশ্চিম দেওয়াল ঘেঁষা ডালকাটা সজনেগাছ জোড়াকে ন্যাংটোর মতো কুৎসিত দেখায়। রান্নাঘর থেকে পুঁটিমাছ ভাজার আঁশটে গন্ধ ঘরের দাওয়া ভরিয়ে রাখে। দামাল বাছুরজোড়া হাম্বা ডাক এবং খুঁটি তোলার দুরন্ত চেষ্টা চালায়। সূর্য দুলে দুলে পড়ে, 'আওরঙ্গজেবের ধর্মের গোঁড়ামি এবং অনুদারতা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। অঁা, আওরঙ্গজেবের, অঁা আওরঙ্গজেবের ধর্মের—।' চঞ্চলা বাইরে থেকে ছুটে এসে বলে, 'অ বাবা ইলেকটিরিকের লুক এসেছে, দেখ গা বামুজ্জে ঘরে কাজ করছেক, অ বাবা আমাদের আলা লিবে না!' ঘর থেকে কাজলা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসে। ডোরা শাড়ি, টিয়ারঙ ব্লাউস উজ্জ্বল শ্যাম মেয়ের ঢলঢলে গোল মুখ। আড়চোখে রান্নাঘরে মাকে দেখে উঠোনে নামে। পাশের গাঁয়ের সুবোধ তার বন্ধু সুধার দাদা—ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। সুবোধের সঙ্গে তার প্রণয়। জ্যোৎস্নাময়ী কীভাবে যেন টের পেয়ে গিয়েছেন। চঞ্চলা দিদির দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসে। সুবোধ এসেছে পাড়াতে।

দাওয়ার দেওয়ালে হেলান দিয়ে এ মুহূর্তে ফটিক তার পদক্ষেপ বিষয়ে চিহ্নিত হয়। বুধের কাছে সরাসরি ব্যাপারটা উত্থাপন করা সঙ্গত কি না। পৃথিবী বড়ই অকৃতজ্ঞ। বুধেকে তার যথেষ্ট স্নেহ রয়েছে। বুধের দেহে অসুরের বল। যেমন শক্তপোক্ত চেহারা তেমনি সৌষ্ঠবেও সুপুরুষ। গেরস্ত বলে মান্যগণ্য করে। বীজ, সার, বলদ, লাঙল সব তার। বুধের শুধু শ্রম। ফটিকের মনে এসে পড়ে, অসুখে বুধেকে সে কর্জ দিয়েছে, ওর বৌকে পুজোয় চল্লিশ টাকা দামের শাড়ি দিয়েছে, ঘরে এলেই চা রুটি দেয়। শীতে কাজলা বুধের জন্যে একটা সোয়েটার বুনে দিয়েছে। তবে কি না, ফটিক এটাও স্বীকার না করে পারে না, বুধের জমির উপর এক গভীর মমতা আছে। উৎপাদন বাড়ানো, মাটির শক্তি রাখা, জল যথাসময়ে দিয়ে তোয়াজ এ সবে তার এক চুল বিচ্যুতি নেই। জমিকে সে মায়ের মতোই আদরে রেখেছে। উঁচু নিচু নিজে কোদাল পেড়ে সমতল করে। আলের বাঁধুনিও দেখার মতো। গাঁয়ে বুধে একজন দক্ষ ফলনকারী চাষী বলে সুখ্যাতিও পেয়ে থাকে। এসবে গেরস্ত হিসেবে তার অহংকারকে আরও উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু তা বলে বুধে তো বর্গাদার হতে পারে না!

ফটিকের মনে হয়, এটা কারও চক্রান্ত। বুধে তারই শিকার হয়েছে। সাতকড়ি বলেছিল, 'তুমার ত বগ্‌গাদারে ডর নাই, বুধে ঘরের লুক।' সে

মিষ্টি হাসিতে সমর্থন জানিয়েছিল। এরকম ঈর্ষা সে সাধন ঘোষ, কানাইয়ের চোখেও দেখেছে। বস্তুত বর্গাদার নামক ঝটিকাটি গাঁয়ের মাটিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত তথাকথিত ভদ্রলোক পাড়াতে এসে পড়ে দিশেহারা করে দেয়। সম্পূর্ণ স্বত্বলোপের আতঙ্ক সকলেরই চোখে। জমি নামক ব্যাপারটা দু'পাঁচ বিঘে জমির মালিকের কাছে যন্ত্রণা মনে হয়। বিত্তের মতো জমিও হরণ করা যায় না, ব্যবহারে উৎপাদন দেয় এবং বেঁচে থাকার এক পোক্ত ভরসা, এই চিরন্তন বোধকে আঘাত হানে। কোথায় কাগজে কলমে খতিয়ানে দাগ নম্বরে অধিকারীর পাশে বর্গাদারের নাম উঠবে, এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। বর্গাদার নামের একটা দুরন্ত নদী গেরস্ত এবং কিষাণের মধ্যে প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে থাকে। ফটিক কিন্তু এতে মোটেই বিচলিত হয় নি। জ্যোৎস্নাময়ী পড়শির খবরে এবং বর্গাদার নামের শব্দটায় কম আতঙ্কিত ছিল না। তবে কি না বুধে নিজে নিজে বলে, 'না গেরস্ত, বর্গাদার কুন দুখে হতে যাব!' এবং এ বিষয়ে তার বিরূপতার কারণ হিসেবে বুধে অন্যের জমির মালিক হওয়া যায় না এবং সূর্যচন্দ্র উঠছে, ধর্ম নামে একটা ব্যাপার আছে, সেটাও সভয়ে উচ্চারণ করেছিল।

ফটিকের রোগা কাঠিসার চেহারায়, দুটি চোখ বড় বেশি উজ্জ্বল। লম্বাপানা মুখে গোঁফদাড়ি ঘন নয়। একটু মেয়েলি ঢঙ আছে। কপাল সামান্য উঁচু। স্বচ্ছলতা এবং জীবনযাপনের অব্যাহত ধারাজনিত একটা সুস্থতার ছাপ তার দীর্ঘ নাসা, সরু ঠোঁট এবং চিবুকে দৃশ্য হয়। শরীরের অনুপাতে মুখমণ্ডলের প্রাণবন্তা পঞ্চাশ ডিঙিয়ে যাওয়া বয়সেও অঁটসাঁট হয়ে বসে আছে। অতিরিক্ত নীলে চুবোন গেঞ্জিটা বেয়াড়া ঢলঢল করছে এখন। উঠোনের রোদে ঠায় তার দৃষ্টি বাঁধা। বাইরে গিয়ে মুকুন্দর কাছ থেকে শুনে এসে সেই যে বসেছে, বিড়ি ধরায় নি একটা। গোবর সার দু'গাড়ি দেবার কথা পেহ্লাদের। যেতে হত। বাছুর দুটো বাঁধা। বাগাল ধনা সেই যে ঘর গিয়েছে ফেরেনি। গাই দুইতে হবে। একটু হাঁকডাক করার সঙ্গতিও তার এখন নেই। বিছুটির জ্বলুনির মতো বুধে তার সর্বাঙ্গে ঘষে গিয়েছে।

বর্গাদার ব্যাপারটা এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়। জমি চষে যে মানুষটা তার নাম লেখা হলে সে বোঝে এতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। বুধেকে তার প্রয়োজন। বুধে চিরকাল চষে যাক, এটা তার আন্তরিক কাম্য। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, নাম লেখানোর পর ভাগ দেবে কি না, বিপদ-আপদে বিক্রি

করতে চাইলে রাজি হবে কি না। গ্রামের ঘটনাগুলো কিন্তু পরপর অবধারিত গেরস্তর অধিকারচ্যুতির ইঙ্গিত করছে। বুধের স্বাতন্ত্র্য বিশ্বাস-যোগ্য এমন নিশ্চয়তা কোথায়! বুধের অধিকারের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়াটাও তো বিশ্বাসভুক্ত ছিল না। ফলে ক্রোধ তার রক্তের মধ্যে চিন্তামাত্র প্রবল বেগে ধাবিত হচ্ছে। ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলতে দুর্মর ইচ্ছে।

রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে জ্যোৎস্নাময়ীকে সংবাদটা দিতেই মেয়েমানুষের চোখের পাতা পড়ে না। পানপাতা ডৌল কালো ভারী মুখ, পান খাওয়া পুরু লাল ঠোঁট, ভ্রু'র উপরে কপালে গালে চিবুকে, ঠোঁটের উপরিভাগে ঘাম জবজবে। চুড়ি, শাঁখাপরা হাতে খুন্তি। চোখের পাতা পড়ে না মেয়েমানুষের। এবং একটা অস্ফুট আর্তনাদও বেরিয়ে আসে, 'বল কি গো!' যেন পরমাত্মীয় বিয়োগের সংবাদ এইমাত্র তার কাছে পৌঁছাল।

ফটিক শুধু বলে, 'হুঁ।'

'তুমি ছেড়ে দিবে?'

'কী করব!'

'বুধেই এমুন করলেক!'

'লুভ!'

'হারামজাদাকে ঘরে ঢুকতে দিও না। আসুক ঠাকরুন বলে—।'

'উহুঁ, কুছু বলো না।'

'দিদি ঠিকই বলেছিল, ছুটুলুককে কুনু বিশ্বেস নাই।'

বঙ্কু এসে ডাকে, 'কাকা ঘরে রইছ, অ কাকা।' তারপর উঠোন ডিঙিয়ে রান্নাঘরের দিকে যায়। পাজামার উপর পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। ফরসা রোগা ছোকরা। কলেজে পড়ে। বলে, 'দেখলে ত। শুনেছ নিশ্চয়ই বুধে কী করেছে! খুব তো বিশ্বাস ছিল। তখন বললাম, দাও হাইকোর্ট করে। সিঁদুরমুখী মৌজাতে ইনজাংসান হয়ে আছে। চড়কডাঙ্গা মৌজা—।'

ফটিক গিরগিটির মতো মাথা নাচায়, 'ঝামেলা ঝঞ্ঝাট আমি পছন্দ করি না, জানিস তো।'

'উঁচুপাড়ার সব গেরস্ত হাইকোর্ট করেছে, খালি—। হুঁ, এবার কী করবে!'

ফটিক টের পায়, সংবাদটাতে বঙ্কু উৎফুল্লিত। গাঁয়ে জোর রাজনীতি

করেছে ! পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়ানোর মতলব আছে। তা থাকুক। কিন্তু তার দুঃসংবাদে উল্লাস এটা কেমন করে সহনশীলতার ঠাণ্ডা ঘরে পুরে সে হাসতে পারে। বঙ্কু একা নয়, সে অনায়াসে কল্পনা করতে পারে, পাঁকে গলা অব্দি ডুবে যাওয়াটাও সমশ্রেণীর কাছে দারুণ উপভোগ্য ব্যাপার। মানুষের মনের মধ্যে অনেক জন্তুর ঘোরপ্যাঁচ রাস্তার ঠিকানা লেখা থাকে। ফলে বুধে নয়, এখন বঙ্কুকে সে প্রতিরোধ করার জন্যে কথার বুনুনি চালায় মনে। এবং বলে 'করুক কেনে, আমি ত জমি বিচছি না। আর ঠিক মতন ভাগ না দিলে তখুনকার কথা তখুন।'

'বুঝলে কাকা, আমাদের একজোট্টা হতে হবেক।'

ফটিক শুধু শব্দ করে, 'হুঁ'। তারপর নীরব হয়ে যাওয়া তার পড়ুয়া পুত্রের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'পড়। তু কি শুনছিস্।'

জোৎস্নাময়ী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, 'এই কাজলী, গেলি কুথা ?'

বঙ্কু উত্তর দেয়, 'ওই যে ইলেকট্রিকের— ।'

জোৎস্নাময়ী জোর পায়ে একেবারে বাইরে দরজায় এসে, ডাকে, 'কাজলী-কাজলী, চলে আয়। পাস দিয়ে তুর ধিঙ্গিপনা ঢের বেড়েছেক, চলে আয় বলছি।'

কাজলী ভয় ভয় চোখে মায়ের দিকে তাকায়। জোৎস্নাময়ী একটিও কথা বলেন না। মানুষের মুখের ভাষার চেয়ে দৃষ্টির ভাষা মোটেই দুর্বল নয়।

তুমুল রোদ এবং গরম হাওয়ার দিন বিকেলে পশ্চিম আকাশ ঝাঁপিয়ে কালবৈশাখীকে পেড়ে ফেলে। বৃষ্টির চেয়ে ঝড় ধুলোবালি পাতা খড়কুটো নিয়ে এন্তার ভাঙচুরে মুহূর্তে আবহাওয়ার বদল ঘটিয়ে দেয়। এবং পুরো গাঁ জুড়েই এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। ভাঙচুর বাসার পাখপাখালির আর্তনাদ, মানুষের হাঁকডাক, ছাগল, ভেড়া, গরু, মোষের বিপর্যস্ত এবং দলছাড়া অবস্থার ডাক, ভেঙে পড়া আমের ডাল, উড়ে যাওয়া খড়ো চাল, বাতা বেকারি খড়ের জায়গায় জায়গায় স্তূপ এবং তা সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ততা সামান্য বৃষ্টিতে গা ভেজা গাঁয়ের মাটিতে অস্ত-সূর্যের তলায় পুরোদমে হুল্লোড়িত হয়। 'অ টেঁপি, আমাদের ছাগলটা দেখেছিস্, কালো পাঁঠিটা লো, কুন দিকে যে গেল', 'আহা বিবাক চাল যি তুমার উড়ে গেইছে খুড়ো', 'দুটো লম্ব একটা ডাল ভেঙেছে আমের, লে শালা ইজমালির গাছ ভা'য়ে ভাইয়ে ইবার লাগুক, যেমুন কেবো তেমনি নীলে, দুই সুমান', 'জল হলে ভাল হত হে, খালি ঝড়,

তা একটুস্ ঠাণ্ডা ত হল' ইত্যাদি বচসাও এর মধ্যে সমান চলে। আকাশে অস্ত-সূর্যের ফেলে যাওয়া আলোটুকুও মুছে যায়।

এমন সময় ফটিককে বাগাল ছোঁড়া ধনা সংবাদ দেয়, একটা বাছুর আসে নি। চন্দ্রনাথ এবং সূর্যও খুঁজতে বের হয়। অন্য গাঁয়ের পালে গেলেই বিপত্তি। ঝড়ের সময় গাঁয়ের বাইরে পাশের গাঁ রসপুর আর ছাতিনার পালও ছিল। গোয়ালে গাইটা বাছুরের জন্যে আকুল। ওটাকেও ছেড়ে দেয় ফটিক। এদিকে পরতে-পরতে কালো ধোঁয়ার মতো অন্ধকার নেমে পড়তে থাকে। চারপাশের শব্দরা সেই ধোঁয়ায় আটক পড়ে যায়। ঘরে লম্ফ, হ্যারিকেন জ্বলে। কিন্তু গাইবাছুর বাইরে থাকলে সোয়াস্তি কোথায়। ফটিক বারবার ঘরবার করে। চন্দ্রনাথ এবং সূর্য দুবার ঘুরে এসে সংবাদ নেয়, এসেছে কি না। ধনার কোনো পাত্তা নেই। ক্রমে আকাশে তারা ফোটে। ঝড় এবং সামান্য বৃষ্টিপাতে অন্যদিনের তুলনায় এক শীতল সন্ধ্যা। কিন্তু বাছুরের উদ্বেগ চরম উষ্ণতাকে জড়িয়ে রাখে। জোৎস্নাময়ী রাতের আহারের জন্যে উনুন পর্যন্ত ধরায় না।

বুধে, ধনা, গাইবাছুর একসঙ্গে ঘরে আসে। ততক্ষণে আকাশময় নক্ষত্র। বাছুরের সঙ্গে বুধে সোয়াস্তি এবং জ্বলুনির সংমিশ্রিত আকর। ফটিক গম্ভীর হয়ে বলে, 'তু'।

'ধনা বললেক পেছি না; তারি লেগে বেরুলম্।'

'ভাল কথা।' ফটিক বুঝে উঠতে পারে না, সে কীভাবে শুরু করবে। উঠোনে বুধে দীর্ঘ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খালি গা, পাটাল বুক, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কোমরে খাটো একটা টেনা। হ্যারিকেনের আলোতে মুখচোখের প্রতিক্রিয়া বোঝার উপায় নেই। ফটিক বলে, 'তুর সঙ্গে কথা আছে।'

বুধে সাড়া করে না। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তু বর্গাদারে নাম লিখালি?'

'হুঁ।'

'কেনে?'

'পাঁচজনাতে বললেক। তাবাদে ভাবলাম, সবাই যখুন লিখাছে!'

'তোকেও লেখাতে হবেক?'

'হুঁ।'

'তারপর পরশা যেমুন মুখুজ্জেদের সঙ্গে লেগেছে তেমনি লাগবি।'

'না গেরস্ত।'

'ধানেরও ভাগ দিবি না।'

'না গেরস্ত।'

'তাহলে লেখালি কেনে?'

'বললেক অধিকার।'

'অধিকার!'

'আজ্ঞে গেরস্ত।'

'তুই কি বলে ছলি মুনে আছেক তুর?'

জোৎস্নাময়ী ওধার থেকে এসে সংলাপে অংশ নেয়। বলে, 'উকে উসব বলছ কেনে? যা করার ত করেছেন। ইবার লিজে বুঝ, লিজে ভাব। উকে ঘর যেতে দাও।'

বৈশাখের দিনগুলি পার হয়ে জ্যৈষ্ঠ, এবং আগামী বর্ষার শুভ সূচক দু'এক পশলা বৃষ্টি ঝরে পড়ে। ইতিমধ্যে ফটিক বুধের সাক্ষাৎকার, সংলাপ, আগামী চাষপর্ব বিষয়ক আলোচনায় বর্গাদার নামক শব্দটির ক্রীড়াশীলতা শুরু হয়েযায়। বুধের ভূমিকা তুচ্ছ। সে নীরব। এবং স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্যে আগ্রহশীল। একক ফটিকই প্রতিপক্ষ ঠাওরে যুদ্ধের প্রস্তুতি গড়ে, অস্ত্রাঘাতে ব্যস্ত হয়। জোৎস্নাময়ীরও মত আর সহজ সম্পর্ক নয়। কিন্তু কিভাবে—সম্পর্ককে কোন ঘটনা-মাধ্যমে হননকারীতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। অসহযোগিতা এক ভয়ঙ্কর আয়ুধ। যেহেতু যুগ্ম কর্মধারাতেই উৎপাদন; সুতরাং—। বন্ধু ঘন ঘন এসে উত্তেজনা বাড়ায়। আশু মুখুজ্জে বলে, 'বুঝলে ফটিক কুছু কর। বলি, মাঠের ধারে ঠ্যাং খুঁড়া করে ফেলে দিতে পার।' গোবিন্দ সংবাদ দেয়, বাগ্দি বাউরিরা বলেছে, ভদ্দরলুকদের তেল মারবে! সিঁদুরমুখী মৌজা ইনজাংশান পাওয়ার পর আশেপাশের মৌজাও হাইকোর্টগামী করার জন্যে চেষ্টা চলে। ফটিক এতে উৎসাহ না দেখানোতে হরেন বলে, 'ফটিকদা বুধের পা ধরবে নাকি গো?' প্রচণ্ড রাগ হয় তার। বুধেকে খাদ অর্থ ও অগ্রিম দাদন দেবার ব্যাপারে হাতের মুঠি খুবই ধীরে ধীরে খোলে। পঞ্চাশ টাকা কর্জ চাওয়াতে সে পরিষ্কার না বলে। কিন্তু কোনো শক্ত আঘাতই দেওয়া যায় না। ফটিকের সব ভাবনার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে থাকে বর্গাদার বুধে।

তারপর উঁচুনিচু আল ডিঙিয়ে গোবর সারের গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে ডান আলি বলদটাকে খোঁড়া করে নিয়ে আসে বুধে একদিন। ভয়ঙ্কর

দুঃসংবাদ। বজ্রাঘাতের মতো নির্মম। ফটিক পুত্রশোকের কাতরতায় হাউমাউ করে কাঁদতে বসে। ধবধবে সাদা বলদজোড়া চমৎকার জুড়ি হয়েছিল। যেমন চেকনাই তেমনই শক্তি। দেখামাত্র যে কোনো ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, 'কার বটে গো বলদজুড়া।' শুনে অহঙ্কারে বুক ফুলত। কান্না, চরম ব্যস্ততা, গোবেদে ডাকা এসবকেই জে'ৎস্নাময়ী মুহূর্তে নিরসন করিয়ে দিল। উপলব্ধি করিয়ে দিল, ডান আলির পঙ্গুত্বপ্রাপ্তি আশীর্বাদ। প্রতিহিংসার অন্ধত্ব বড় ভয়ঙ্কর। বলদটাকে ভেতো মদ, পটি বাঁধা, গণেশপুর থেকে গো বেদে তারণকে নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থার পরও দেখা গেল, চাষে অক্ষম। এটাই কাম্য ছিল। বুধে নতুন বলদ কেনার কথা বলতে বলে বসল, 'টাকা কুথা পাব? উতে চষ।'

'সি কি গেরস্ত, খঁ্ড়া বলদে চাষ হবেক কি?'

'তার আমি কী করব বল।' ফটিক দিব্যি হাত নাড়া দিল।

'আপুনার প'য়ে পড়ি গেরস্ত, এমুনটি করবেন নাই।'

ফটিক বলল, 'উপায় নাইরে। নাহলে চাষ না হলে ত আমারই খেতি।'

গাঁয়ে ব্যাপারটা নিয়ে চরম উত্তেজনা। ফটিককে বাহবা দিয়ে গেল অনেকে। সংবাদও দিল, বুধে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে বলদের। গোপীনাথদের দলে গিয়েছিল। তা ঢুঁ ঢুঁ। এ সময় বলদ দেবে কে! এদিকে দিন এগিয়ে চলে আকাশের দেবতা এবার একফসলি ভঁ্ইয়ের উপর যথেষ্ট সদয়। আগেই বুঝি নেমে পড়বেন। তার আভাস দু'একদিন ছাড়া ছাড়া দেখিয়ে যান। চাষের মরসুমের ব্যস্ততা সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে কিছু কিছু জমিতে। বুধে আসে না।

জোৎস্নাময়ী বলে, 'বুঝলে একবছর ধান না হলে আমরা মরব নাই। উ কী করে দেখ। জান পাড়াতে বলছেক বেশ করেছ তুমরা।'

ফটিক হর্ষ অনুভব করে। স্ত্রীর উপর চোখ রেখে বলে, 'বুধের বৌট এসেছিল—লয়?'

'হুঁ, চালের লেগে। তা চাষ না হলে চাল দিবেক কে!'

চন্দ্রনাথ বলে, 'বাবা এ তুমি ঠিক করছ না!'

ফটিক দাবড়ে দেয়, 'চুপ করে থাক।'

প্রতিহিংসার চরম উত্তাপ ঘরের হাওয়ায় ভরপুর হয়ে থাকে। বুধের বলদ সংগ্রহের দুরন্ত চেষ্টার সংবাদ আসে। এবং বুধে যে তার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে এমন কথাও শুনতে হয়। কিন্তু ফটিকের এতে বিশেষ প্রতিক্রিয়া

নেই। সে খোঁড়া বলদে অনায়াস চাষ হতে পারে, বুধেরই অনাগ্রহ, এ ধরনের কথা বলে বেড়ায়।

আকাশের দেবতা জোর বর্ষণ ছুঁড়ে যান ছাড়া ছাড়া ভাবে। একফসলি জমির উপর পরম আশীর্বাদের মতো। বীজ বোনা শুরু হয়ে যায়। ফটিকের আবহাওয়া থেকে মনে হয় এবার উৎপাদন ভাল হবে। সে কল্পচোখে গাঁয়ের চারপাশে অগণিত গ্রীষ্ম জর্জর ক্ষেতকে শস্যশ্যামলা দেখতে পায়। বায়ু তরঙ্গ সবুজ সমুদ্রে ঢেউয়ে ঢেউয়ে আন্দোলিত করে। তবে কি না দেবতার হালচাল বোঝা দুষ্কর। শেষদিকে মুখটি বুজে দিলেই কুপোকাত। এসব চাষ সংক্রান্ত উদ্বেগাকুল ভাবনার মধ্যে বঙ্কু এসে ঠাট্টার ছলে বলে, 'কাকা দেখে এসো গা তুমার মাঠগলা। শালা, জল খেছে।' কানাই বলে, 'তুমার মাঠগলা দেখে মুনে হয়, হ্যাঁ পুরুষ মানুষ বট, লে সামলা ইবার বগ্‌গাদার। সব দিবেক গমমেণ্ট', শোনাতক্ ফটিকের মাঠগুলো দেখার বড় বাসনা হয়। ছাতাটা মাথায় নিয়ে এক বিকেলে সে বেরিয়ে পড়ে। দুপুরে আকাশের দেবতা একটা বর্ষণের ঝাপটা দিয়ে থেমে আছেন। তবে কিনা আকাশের ঘোলাটে মুখের গর্জানি সূর্যকে হেনস্তা করে রেখেছে। যে কোনো সময় তিনি ঝাঁপাবেন। গাছগাছালিতে এখনও জলের টোপা আটকানো। মাটি ভেজা। ঢালু জায়গায় কাদা। প্রকৃতিতে বর্ষার গন্ধ ভুরভুর করছে। পোড়া মাটি ভিজে বাতাসে তার তৃপ্তির স্বাদকে মিশিয়ে দিয়েছে। ফটিকের চাষীসত্তায় সেই ঘ্রাণ চমৎকার উঠে আসে। বড় আনন্দময় এই ঘ্রাণ।

বালিচক মৌজাটা গাঁয়ের পশ্চিমে। পাশাশাশি আল বাঁধা চারটে দাগনম্বরে তার দেড় বিঘে ভুঁই। সামনে এসে ফটিক স্তম্ভিত। ক'টা শালিখ বোধ করি পোকা সংগ্রহে ব্যস্ত। মাথার উপর একটা কাক ডাক ছুঁড়ে যায়। ওদিকে হাল মারছে ভূপতি। পাশে কানাইয়ের বীজতলা অর্থাৎ আফড়ে ভুঁই। সবুজ মুখ উঁকি বাড়ায় নি। তবে এবার বাড়াবে। কিন্তু তার বীজতলা। ফটিক সারা শরীরে বিছুটির তিড়বিড়ানি জ্বালা অনুভব করে। কেমন যেন ঘন ছায়া বিষাদের মতো মেঘলা বেলার সঙ্গে নেমে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। ফটিকের মনে হয় একটা ভয়ঙ্কর ঠাট্টার মতো তার ভূখণ্ডটুকু হা হা করছে। কিংবা না, ফটিক অনুভব করে নিপাট শুয়ে থাকা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সদ্য বর্ষাস্নাত ঘাস ছাওয়া এই ক্ষেত যেন বড় দুঃখিনীর মতো শুয়ে আছে। অসহায় ক্ষেত যেন বুকে মোচড় দিতে থাকে ফটিকের।

মস্তিষ্কের কোষে কোষে তার প্রচণ্ড রাগ জন্ম নেয়। যেন কোনো শত্রু দ্বারা অত্যাচারিতা মা জননী ক্ষেত। বুধে এবং নিজে ছাড়াও তৃতীয় প্রাণময় একটা অস্তিত্বের সে যেন আকুল উচ্চারণ স্পষ্ট শুনতে পায়, 'অ রে ফটিক, বাপ আমার, দশা দেখ বাপ। আমার যি দমবন্ধ হয়ে আসছেক। বুক হু হু করছেক। দেখ্—দেখ্—কেম্নন পড়ে আছি দেখ।' ফটিক বিড়বিড় করে, 'শালা বুধে, তুর লেগে শালা।' এবং কেমন যেন ঘোরের মধ্যে পড়ে যায় ফটিক মণ্ডল। সব বোধ তার এখন এই মৃত্তিকাতে লীন। জোৎস্নাময়ী, সংসার, অধিকার, গেরস্ত, মর্যাদার সকলই তুচ্ছ। ক্রন্দনরতা জননীর কাছে সে নতজানু হয়ে পড়ে। অন্নপূর্ণা ক্ষেতই তো জীবন। তাকে কি না সে প্রবঞ্চিত করছে। এই বোধ তার অতীত চাষীস্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়। সে অনুভব করে, তার হাত পা এ মাটি চষার জন্যে বড় ব্যগ্র। যেন দু'হাত বাড়িয়ে তাকে আকর্ষণ করছে। শিকড় ছেঁড়া বৃক্ষের মতো উৎপাটিত হয়ে তার সমগ্র সত্তা এখন আছড়ে পড়তে চায়। তারপর যেন অবোধ এক বালিকাকে তার সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছে হয়, 'দাঁড়া দাঁড়া কাঁদিস্ না, আহা কাঁদার কী আছে? কী লিবি বল, দেখ—কাঁদে দেখ।'

বুধের ঘরে ফটিক মণ্ডল কাঁপতে কাঁপতে হাজির হয়। সন্ধের আঁধার আঁচল উপর থেকে নিঃশব্দে নামছে। বাঁশবনে পাখপাখালির দুরন্ত বচসার শব্দ। ডোবার ওদিকে বুধের ঘরের সামনে গিয়ে দেখে বসে।

'বুধে—এই বুধে তু গেইছিস্ মাঠের ধারে? বলি, দেখেছিস্।'

'যেতে লারি গেরস্ত।'

'কেনে দেখে এস গা, কী দশা করেছ—যাও দেখে এস গা।'

'দেখতে লারি গেরস্ত। খালি খালি চোখে জল আসে। তার লেগে ভাবছিলম্ ভিটেট বিচে দুব। উ টাকাতে বলদ কিনব।

'লেহাল করবে। বলি তু ভিটে বিচার কে? তুর জমি?'

'আজ্ঞে লা গেরস্ত।'

'তাহলে। টাকা দুব আমি। কালকে সকালের মধ্যি বলদ চাই। বলি তুথে আমাতে ঝগড়া, তাতে মা জননী কি দুষ করেছে? আঁ কি দুষ করেছে?' ফটিক মণ্ডল ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সে না গেরস্ত বটে। ক্ষেত না মা জননী বটে।

পরিচয়-এর আড্ডা

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

বালিগঞ্জ প্লেসে প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে আসর বসবার কথা ছিল বলে হিরণের খোঁজে আগে গেলাম। তখন ও ফেরেনি দেখে কিছুক্ষণ বসে একাই চলে যাই। বেশ কিছুদিন পরে নীরেন এসেছিল দেখে খুশি হলাম। হারীতকৃষ্ণ আর বাগচীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। নীরেন প্রশ্ন করলেন, প্রাচীন মানুষ প্রথম যখন শব্দকে অক্ষরে প্রকাশ করতে শিখল তখন লিপির গতিকোণ কোন দিকে এগিয়ে যায়—ডাইনে থেকে বামে, উপর থেকে নীচে, না তার বিপরীত দিকে।

বাগচী আর হারীতকৃষ্ণ দুজনেই প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে অনেক লেখাপড়া করেছেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারলেন না।

সুধীন্দ্রনাথ আর হিরণ একসঙ্গে এলেন। তাঁরা সদ্য শুনে আসা এক বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তার সমাপ্তি টেনে বসে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব ও বিষ্ণু এসে জানতে চাইলেন, প্রামাণ্য কথাটাকে কি বিশেষণ পদে প্রয়োগ চলে! মতামতে বৈষম্য দেখা গেল। আমার মন চলে যায় হিরণের তোলা আর একটি প্রসঙ্গে। তিনি প্রথমে মহেশ নামক এক ভৃত্যের গুরুচণ্ডাল ভাষায় মজার মজার উদাহরণ দিচ্ছিলেন। তারপর কথা উঠল উত্তর কলকাতার সাবেক বাসিন্দাদের কি কোনো নিজস্ব উপভাষা আছে। এ ব্যাপারে হারীতদা হচ্ছেন বিশেষজ্ঞ, কিন্তু সুধীন্দ্র তাঁকে অন্দরমহলে দাসীদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা শোনাতে দিলেন না। আমি বললাম, আফ্রিকা থেকে প্রথম প্রথম এসে এক মাসীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ঝি-এর

কথা শুনে আসি 'মা এখন নাচ্‌ছেন।' ধরেই নিই যে থিয়েটার পাড়ায় যখন বাড়ি, তখন অন্তঃপুরে পুরুষ চক্ষুর অন্তরালে নাচের প্রচলন থাকা বিচিত্র নয়। এক মামীকে সে কথা বললে তিনি হেসেই অস্থির। বুঝিয়ে দেন নাচার অর্থ হচ্ছে স্নান করা।

আমার গল্পে উৎসাহিত হয়ে হারীতদা সুধীন্দ্রকে অগ্রাহ্য করে তাঁর নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে দিলেন। মনে হল তৎক্ষণাৎ রচিত। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। সুধীন্দ্র বিরক্ত হন যখন শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। আজ শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল। 'প্রামাণ্য' কথাটি নিয়ে যে ব্যাকরণের প্রশ্ন তোলা হয়েছিল তার কী নিষ্পত্তি হল স্মরণ হচ্ছে না।

বাগচীর জলযোগের ব্যবস্থায় ঢাউস আকারের গরম গরম সিঙ্গাড়া আর কড়া পাকের সন্দেশ থাকে বলে হিরণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন।

খাওয়ার পর্ব চুকলে মল্লিকদা ও সাহেদ-এর নিরাপত্তা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা হল। কাউলি কারখানার অঙ্গাঙ্গী থাকায় অক্সফোর্ডে বোমা বর্ষণ হতে পারে—ভরসা মল্লিকদার শিষ্যরা নিশ্চয় তাঁকে ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে ঢুকিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছে। ভয় সাহেদকে নিয়ে। সে এখন কনভয়ের কক্ষপুটে ইউ বোট এড়িয়ে মাঝ দরিয়ার কোথায় তার পাত্তা নেই।

সুধীন্দ্র একটু হেসে বললেন, 'প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সাহেদ-এর এক বন্ধু টরপেডো আক্রমণের ফলে কিছুক্ষণ জলে ভেসে থাকার খেসারৎ বাবদ একশ পাউণ্ড আদায় করেছিল—সাহেদের বোধহয় সেই রকম কোনো মতলব আছে'।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

আজকের বৈঠকে হুমায়ুন কবির এসেছিলেন। আমি সুধীন্দ্রর বাড়ি গিয়ে দেখি তখনও আর কেউ আসেন নি। যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কবির আমার দিকে ফিরে বললেন, শ্যামলবাবু সঠিক খবর দিতে পারবেন—বলুন আরও কতদিন এইভাবে চলবে।

আমি আন্দাজে কিছু বলতে রাজি নই দেখে সুধীন্দ্র বললেন, আমার তো মনে হয় অক্টোবরের মধ্যেই একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

কবির বললেন, চার্চিল আর সে ভরসা করছেন না। তাঁর এক বক্তৃতার বেতার ভাষণে আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে যে এইভাবে চললে সাম্রাজ্যের কাঠামো ভেঙে পড়তে বিশ বছরও সময় লাগবে না।

সুধীন্দ্র বললেন, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করতে হলে ইংল্যাণ্ডকে এক বছরের মধ্যে দেউলিয়া হয়ে যেতে হয়।

প্রশ্ন উঠল জার্মানি কেমন করে অর্থনীতির নিয়মকানুন পাশ কাটিয়ে এমন বিপুল হারে বিমানবাহিনীর সরঞ্জাম, রণতরী, সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক, কামান প্রভৃতির উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছে। ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমের যথাযথ নিয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে, কিন্তু কাঁচা মাল আমদানির জন্যে তো নগদ খরচ করতে হয়।

সুধীন্দ্র বললেন, জার্মান বৈজ্ঞানিকরা বিকল্প ব্যবস্থায় পারদর্শী।

কবির বললেন, রাশিয়াতে তো ম্যাঙ্গানিজ নেই, তারা কেমন করে ইস্পাতের চাহিদা মেটাতে স্বনির্ভর হতে পেরেছে।

এই একমাত্র প্রসঙ্গ যে সম্বন্ধে গোষ্ঠীর সকলের চেয়ে আমি বেশি ওয়াকিবহাল। বললাম, রাশিয়া হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে ম্যাঙ্গানিজের সবচেয়ে বড় উৎপাদক—য়ুক্রেন ও ককেসাস অঞ্চল থেকে যে পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ তোলা হচ্ছে পৃথিবীর অন্য সকল দেশে যা উৎপাদন হয় তার চেয়ে বেশি।

সুধীন্দ্র জার্মানির প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললেন, ইংল্যাণ্ডের দায়িত্বশীল মহলে অনেকে মনে করেন জার্মানির অর্থনৈতিক ভারসাম্য ভেঙে পড়তে বাধ্য।

কবির বললেন, এ্যাকসিস শক্তির স্পর্ধা এমন এক পর্যায় উঠেছে যেখান থেকে কোনো নতি স্বীকার আশা করা যায় না।

আমি বললাম, রাশিয়াকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য থাকলে পশ্চিমি শক্তি-গুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

সুধীন্দ্র বললেন, শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা যায় না—সে যাই হোক কিন্তু ইংরেজের জায়গায় আর কোনো শক্তি এসে আমাদের ঘাড়ে চাপলে আমাদের দুরবস্থা বড়বে বই কমবে না।

হুমায়ুন সে কথায় সায় দিলেন না ; তাঁর মতে যে-কোনো পরিবর্তন আমাদের পক্ষে শুভ হবে। তারপর তাঁর মনে পড়ল এম এন রায় তাঁকে বলেছেন যে জার্মানি যদি নরওয়ে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে না পড়ে তাহলে তিনি রাজনীতি করা ছেড়ে দেবেন।

সুধীন্দ্র বললেন, তিনি অন্য বিচক্ষণ লোকের কাছেও সেই কথা শুনেছেন।

কামাক্ষী এসে খবর দিলেন, বুদ্ধদেব 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন।

কবির বললেন, তাঁর সময়াভাব কিন্তু বাধ্য হয়ে কাজের ভার নিতে

হচ্ছে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনাকে নিয়মিত গ্রন্থ সমালোচনা করতে হবে।

হিরণ এলেন দেরি করে। কোথাও আটকে পড়ে থাকবেন। দেখলাম ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে ভাবনা কোনো কারণে তাঁকে পেয়ে বসেছে। কয়েকটি ধারার উল্লেখ করে বললেন, জৌনপুর হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।

সুধীন্দ্র বললেন, তাঁর বিবেচনায় পাঠান স্থাপত্য মহত্তর। সেকেন্দ্রাকে তিনি বেশি উচ্চ স্থান দেন না।

হিরণ কিছু বলবার আগেই অরুণ সেন, অবনী ব্যানার্জি, আইয়ুব, হীরেন মুখুজ্যে আর বিষ্ণু দে প্রায়ই একই সঙ্গে ঢুকলেন। নতুন কোনো আলোচনা শুরু হবার আগেই হিরণ উঠে পড়লেন। তাঁকে এক জায়গায় পৌঁছে দেবার কথা ছিল বলে আমাকে বিদায় নিতে হল। হিরণ গাড়িতে উঠে বললেন, অরুণ সেন যখন ব্যারিস্টার হয়ে দেশে আসেন তখন তাঁর মতো সুদর্শন পুরুষ আর একটা দেখা যেত না।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

পার্সি ব্রাউন-এর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন হিরণ। সেখান থেকে সোজা সুধীন্দ্রর বাড়ির আড্ডায় যাই। সারা পথ হিরণ একটা ভাবাবেশের মধ্যে ছিলেন। ব্রাউন বলেছিলেন, আজকের দিনে যখন য়ুরোপের স্থাপত্য শিল্পে সমৃদ্ধ শহরগুলি নির্বিচার বোমা বর্ষণের লক্ষ্য হতে চলেছে তখন তাঁর ভাষণ নিরর্থক হতে পারে, কিন্তু তিনি জানেন যে এই ধ্বংসকাণ্ডের প্রতিবাদে জনমত গড়ে তোলার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাচীন শিল্প রীতি ও তার বিবর্তনের কথা স্মরণ করা।

সুধীন্দ্রর ঘরে বসেও হিরণ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। আইয়ুবকে সুধীন্দ্র বললেন, এইচ জি ওয়েলস-এর আপ্তবাক্য 'রেলিজিয়ান ডিনোটস ফাইনালিটি অ্যাণ্ড সায়েন্স ডাস নট গো বিঅ্যাণ্ড এক্সপেক্টেশন' হচ্ছে এমন একটা সরলীকরণ যাতে তাঁর অপত্তি আছে।

আইয়ুব চেপে ধরলেন, বুঝিয়ে বলুন।

হিরণ বললেন, অনেক বাক্য দ্ব্যর্থক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। ওয়েলস কী বলতে চেয়েছেন তলিয়ে দেখতে হবে।

হারীতকৃষ্ণ বললেন, হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের ছয়টি শাখার কোনোটিই স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নি।

আইয়ুব-এর একটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বলেন, মহাযান বুদ্ধধর্মীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের কৃপাবর্ষণ ছাড়া আত্মার পরিত্রাণ নেই।

সুধীন্দ্র খ্রিস্টীয় ধর্মের আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তনের নানা ধা-। এমন বিশদভাবে তুলে ধরলেন যে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন, সুধীন্দ্র তার পিতৃব্যের অভিনয়ের দক্ষতা ও পিতার বাগ্মিতা দুই আয়ত্ত করেছে—আমি মনে করি বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে তার মতো পক্ষপাত বর্জিত মানুষ খুব কমই আছে।

সুধীন্দ্রর একটি কথার পিঠে আইয়ুব বললেন, কোরানের বাক্য স্বতঃসিদ্ধ মনে করা হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থ নিয়ে মতান্তর দেখা যায়।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

টেলিফোনে খবর পেলাম সাহেব সুরাওয়ার্দি ফিরেছেন এবং আজকের আসরে আসবেন। হিরণ বললেন, তিনি সন্ধ্যার মধ্যে চলে যাবেন। আমারও য়ুরোপের টাটকা খবর শোনবার আগ্রহ ছিল কিন্তু গাড়ি নিয়ে গৃহিণী গিয়েছিলেন বেগম মুরশেদ-এর বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণে। তবু বেশি দেরি হয় নি। সুধীন্দ্রর বাড়ি গিয়ে দেখি অনেকে এসে গেছেন কিন্তু সাহেদ তখনও আসেন নি।

বিষ্ণু, আইয়ুব, হিরণ ও সুধীন্দ্র য়ুরোপের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। অপূর্ব চন্দ ব্যস্তসমস্তভাবে এসে খবর দিলেন, রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কাজনক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চন্দ বললেন, বোলপুর থেকে টেলিফোন যোগে খবর আসা পর্যন্ত তিনি ছুটোছুটি করে শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা করেছেন—সত্যসখা মৈত্র ও জ্যোতিপ্রকাশ সরকার মেল ধরে যাবেন আর অনিল যাবে অন্য সকলকে নিয়ে এক্সপ্রেসে।

দুঃসংবাদ শুনে আমরা সকলে স্তব্ধ হয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। অপূর্ব চন্দ বেশিক্ষণ নীরব থাকার পাত্র নন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার আলোচনা শুরু করে বলেন, তাঁকে বহরমপুর কলেজে বন্দেমাতরম গান নিয়ে কলহের সরজমিন তদারকে যেতে হয়েছিল—দু দলেরই দোষ—

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই সাহেদ ঢুকে সুধীন্দ্রর হাতে মল্লিকদার লেখা একটি চিঠি দিয়ে পড়ে শোনাতে বললেন। গোষ্ঠীর সকল সভ্যকে উদ্দেশ্য করে লেখা। আমাদের জানিয়েছেন যে এতদিন যা চিন্তা করছিলেন তার কিছু কিছু সারাংশ প্রকাশ করা হয়েছে। আরও বলবার আছে—লেখা

চলতে থাকবে। সঙ্কল্প মতে এগিয়ে যাবেন। আত্মীয়দের মধ্যে থেকে এক-জনকে মনোনীত করেছেন যাকে প্রকাশনের দায়িত্ব ও যথেষ্ট টাকা দিয়ে যাবেন। কাজ এগিয়ে যাবে।

মল্লিকদার সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় উপস্থিতদের মধ্যে অনেকে মজা পেলেন কিন্তু আমি কোনো ভাব প্রকাশ করলাম না লক্ষ্য করে অপূর্ব বললেন, মিস্টার ঘোষ কিছু বলছেন না যে।

আমি বলে ফেললাম, মল্লিকদার কথায় আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

আড্ডার মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলা হচ্ছে আমার অভ্যাস। একটু উষ্মা প্রকাশ করে ফেলে অপ্রস্তুত বোধ করলাম।

হুমায়ুন কবির-এর জরুরি কাজ ছিল বলে বিদায় নিলেন। সাহেদ-এর সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার গল্প ইতিপূর্বেই শুনে থাকবেন। আমরা নিবিষ্ট মনে শুনলাম—প্যারিস যে এভাবে অসহায়ের মতো হঠাৎ আত্মসমর্পণ করবে সে কথা তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি। রেনো অবশ্য রেডিওর মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে দুঃসংবাদ দেবার আছে, কিন্তু তার পরেই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর দেখতে দেখতে সারা শহর কালো ধোঁয়ায় ভরে যায়। শোনা যায় পেট্রোলের ট্যাঁকিগুলোতে আগুন লাগানো হয়েছে। ব্যাপারটা যে গুরুতর বোঝা যায় যখন বিদ্যুৎ, জল আর গ্যাসের সরবরাহ একসঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। চৌদ্দ তারিখের আগে জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী রাজধানী প্রবেশ করে নি। যখন করল তখন সেই সঙ্গে জল বিদ্যুৎ আর গ্যাসের প্রবাহ আবার সবল হয়ে ওঠে। জার্মানরা পূর্বপরিকল্পিত প্ল্যান মতো প্রথমে দ্রুত গতিতে রাজপথের বড় বড় সংযোগ স্থলগুলো দখল করে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই হয় নি। দেখা যায় ফরাসি পুলিশ যে যার জায়গায় কাজ করে চলেছে। তফাতের মধ্যে ট্র্যাফিক পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে জার্মান। জার্মানিরা ফরাসি আইন অথবা ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করে নি। বড় বড় হোটেল ও রেস্তোরাঁর দরজায় জার্মান ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয় জার্মানদের প্রবেশ নিষেধ। প্রতিপল্লীতে মাত্র একটি করে রেস্তোরাঁতে জার্মানরা প্রবেশের অনুমতি পায়।

সাহেদ অবশ্য মাত্র তিন দিনের ব্যবস্থা দেখে আসেন। সেই সময়ের মধ্যে কোনো পক্ষের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ চোখে দেখেন নি অথবা কানে আসে নি। জার্মান সৈনিক দেখতেন দল বেঁধে বড় বড় সুসজ্জিত দোকানগুলির জানালায় প্রদর্শিত জিনিসপত্র দেখছে।

ফরাসি আইন বলবৎ থাকায় ব্রিটিশদের শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধা ছিল না। অবশ্য পেট্রোলের অভাব ছিল পালিয়ে যাবার মস্ত বড় অন্তরায়।

সাহেদ ও তার জনাকয়েক রাশিয়ান বন্ধু একশ লিটার পেট্রোল ও একটি ছোট গাড়ি যোগাড় করে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়, কিন্তু ফ্রান্স ত্যাগ করবার আগে লাটুশ নামে এক গ্রামের মেয়র তাকে ইটালিয়ান গোয়েন্দা ভেবে গ্রেফতার করে হয়রান করে। অপরাধের মধ্যে তাঁর পাসপোর্টে ইটালি থেকে বহিরাগমনের পরেই ফ্রান্সে প্রবেশের সাক্ষ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁর কাগজপত্র দেখে বোর্দো পর্যন্ত যাবার অনুমতি দেয়। অবশেষে ব্রিটিশ এ্যাডমিরালটির ব্যবস্থাপনার গুণে জার্মান টহলদারি জাহাজের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে আসেন। বোর্দো পর্যন্ত তিনি কেবল রেড ওয়াইন খেয়ে থাকেন। বোর্দোতে খাদ্যাভাব ছিল না। খাবারের অভাব ফের বেশি দেখেন ইংল্যাণ্ডে। সাহেদ আরও বলেন, ফরাসি সেনা বাহিনী বীবের মত যুদ্ধ করেছিল কিন্তু দুর্বলতা ছিল সংগঠনে, তাই জার্মান শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে নি।

জার্মান সামরিক সংগঠনের প্রশংসায় সাহেদ শতমুখ হলেন। বললেন ব্রিটিশ নৌবহর আর বিমানবাহিনীর দক্ষতা প্রশংসনীয় কিন্তু জার্মানির শক্তি প্রয়োগে যে সংহতি ও একাগ্রতা দেখা গেছে সেটা অতুলনীয়।

সাহেদ আরও বললেন, রাজা লিওপোণ্ডকে বিদ্রূপ করা অন্যায়—প্রকৃত পক্ষে জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করা বেলজিয়াম এর সাধ্যাতীত ছিল।

সাহেদ এবার আমাকে বললেন, কেপ ঘুর যাওয়া আসার সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের মনোভাবের কিছু কিছু পরিচয় পান। তারা ব্রিটিশের বিজয় কামনা করে—কারণ বিকল্প শ্বেতাঙ্গ শাসক হচ্ছে আফ্রিকানার—এদের বর্ণবিদ্বেষ হচ্ছে এতই উৎকট যে উৎপীড়নের অবধি থাকবে না।

য়ুরোপ সম্বন্ধে আলোচনার সময় ছিল না বলে সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ হল।

অক্টোবর, ১৯৪০

সুন্দরবন ডেসপ্যাচ জাহাজে করে বেড়াতে গিয়ে গৃহিণী চক্ষু রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। কয়েক সপ্তাহ পরে আসরে গিয়ে দেখি সুধীন্দ্রর স্ত্রী ছবি ও অপূর্ব চন্দ রবীন্দ্রনাথের অসুখের এক সঙ্কটকাল সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। আইয়ুব আসতে ছবি উঠে গেলেন।

চন্দ সাহেব আমাকে বললেন, তিনি অন্ধের সেবায় একটি সংগঠন গড়ে

তোলার কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি পূজার ছুটিতে কোথাও যাইনি কিন্তু মাসের প্রথমে সুন্দরবন ডেসপ্যাচে গোয়ালন্দ পর্যন্ত বেড়াতে গিয়ে গৃহিণী বিষাক্ত পোকার আক্রমণে দুই চোখই হারাতে বসেছিলেন। এক রকম গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হয় আমাকে।

এল কোলোনেল নো তিয়েনে কিয়েন লে এস্ক্রিবা

কর্ণেলকে কেউ কিছু লেখে না

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

অনুবাদঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

'আমি ভাবছি সেই লোকটার কথা যে পেনসনের ওপর নির্ভর করে থাকে,' মিথ্যে করে বললেন কর্ণেল। 'পঞ্চাশ বছর পরে আমরা তো শান্তিতে ছ-ফিট মাটির তলায় থাকব, অথচ বেচারি তখনও রোজ শুক্রবারে নিজেকে তিল-তিল করে মারবে তার পেনশনের টাকার অপেক্ষায়।'

'এটা খারাপ লক্ষণ', তাঁর স্ত্রী বললেন। 'তার মানে তুমি এর মধ্যেই হাল ছেড়ে দিতে চাইছ।' তিনি ঐ দলাপাকানো খাবারই খেয়ে চললেন। কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলেন তাঁর স্বামী এখনও অনেক দূরে রয়ে গেছেন।

'এখন, তোমার কিন্তু খাবারটা তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে নেয়া উচিত।'

'খাবারটা খুবই ভালো' বললেন কর্ণেল। 'কোত্থেকে এল?'

'কুঁকড়োর কাছ থেকে', উত্তর দিলেন স্ত্রী। 'ছেলেগুলো ওর জন্য এত ভুট্টা নিয়ে এসেছিল যে কুঁকড়ো আমাদেরও তার ভাগ দিতে চাইল। জীবন এই রকমই।'

'তা ঠিক,' কর্ণেল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'যা কিছু উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার মধ্যে জীবনই সকলের চেয়ে সেরা।'

চুল্লিটার গায়ে বাঁধা কুঁকড়োর দিকে তাকালেন তিনি, আর এবার তাকে কেমন অন্য রকম একটা প্রাণী বলে মনে হল। তাঁর স্ত্রীও তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'আজ বিকেলে ছেলেপুলেগুলোকে লাঠি তুলে তাড়া করতে হয়েছিল,' স্ত্রী বললেন। 'তারা একটা বুড়ি মুরগি নিয়ে এসেছিল—কুঁকড়োর বাচ্চা বানাবে বলে।'

'এবারই প্রথম নয়,' কর্নেল বললেন। 'ঐ শহরগঞ্জগুলোয় ঠিক এ জিনিসই ওরা করেছিল কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে নিয়ে। তারা তখন বাচ্চা-বাচ্চা মেয়ে আনত, তাঁর ঔরসে ছেলেপুলে বানাবার জন্য।'

রসিকতাটা থেকে স্ত্রী হেসেই কুটিপাটি। কুঁকড়োও একটা গাঁক করে আওয়াজ করলে। হলঘরটায় সেটাকে শোনাল মানুষেরই কথার মতো। 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এ জীবটা বুঝি কথা বলবে, স্ত্রী বললেন। কর্নেল আবার কুঁকড়োর দিকে তাকালেন।

'ওর তো সোনার দামে ওজন', তিনি বললেন। এক চামচে দলা মুখে দিয়ে মনে মনে কী সব হিসেব করলেন তিনি। 'ও আমাদের তিন-তিন বছর খাওয়াবে।'

'তুমি তো আর আমায় চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারো না', স্ত্রী বললেন।

'তুমি আমায় চিবিয়ে খেতে পারো না বটে, আমায় তোমাকে জীইয়ে রাখে', কর্নেল উত্তর দিলেন। 'এ প্রায় আমার দোস্ত সাবাসের অঘটন ঘটানো বড়িগুলোর মতো।'

সে রাতে তাঁর ভালো ঘুম হল না, মন থেকে কতগুলো সংখ্যা তিনি মুছে ফেলতে চাইছিলেন। পরদিন দুপুরে খাবার সময় স্ত্রী দু-থালা ভুট্টা সেদ্ধ পরিবেশন করলেন, আর নিজেরটা খেতে লাগলেন থালার ওপর ঝুঁকে পড়ে, চুপচাপ, একটাও কথা না বলে। কর্নেলের মনে হল স্ত্রীর খারাপ মেজাজটা বুঝি তাঁকেও পাকড়ে ফেলেছে।

'কী হয়েছে?'

'কিছু না,' স্ত্রী বললেন।

কর্নেলের মনে হল, এবার বুঝি মিথ্যে কথা বলার পালা তাঁর স্ত্রীর। তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্ত্রীর মেজাজটা তেমনি থেকে গেল।

'এ কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়,' স্ত্রী বললেন। 'আমি ভাবছিলুম, লোকটা মারা গেছে দু-মাস হয়ে গেল, অথচ আমি কিনা এখনও ওর বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে যাইনি।'

সেইজন্যেই সে রাতেই তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কর্নেল

তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে গেলেন মৃতের বাড়ি অব্দি, তারপর স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে সিনেমাহলের দিকে এগুলেন। লাউড স্পিকারের গানগুলো তাঁকে কেমন টান দিচ্ছিল। তাঁর আপিসের দরজার কাছে বসে পাদ্রি আন্হেল সিনেমার দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন—তাঁর বারোটা সাবধান ঘণ্টা সত্ত্বেও কে-কে ঢুকল নজর রাখতে। আলোর বন্যা, ঢেউতোলা গান, আর ছেলেমেয়েদের হৈচৈ গোটা জায়গাটায় যেন একটা শারীরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। একটি বাচ্চা একটা কাঠের বন্দুক তাগ করে কর্নেলকে ভয় দেখালে।

'কুঁকড়োর কী খবর? নতুন কিছু আছে, কর্নেল?' সে বেজায় ভারিক্কি চালে বললে।

কর্নেল দু-হাত শূন্যে তুললেন।

'এই আছে আর কি, এখনও।'

একটা চাররঙা পোস্টার সিনেমাহলের পুরো সামনেটা ঢেকে আছে: 'মধ্যরাতের কুমারী'। সেই কুমারী হল সান্ধ্য ঢোলাজামা পরা এক স্ত্রীলোক, একটা ঠ্যাং উরু পর্যন্ত উন্মোচিত। কর্নেল তাঁর উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা চালিয়ে গেলেন পাড়াটায়, তারপর দূর থেকে এল বাজের শব্দ, আর বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। তখন তিনি স্ত্রীর খোঁজে ফিরে গেলেন।

স্ত্রী কিন্তু মৃতের বাড়িতে ছিলেন না। নিজেদের বাড়িতেও নয়, কর্নেল হিসেব করে দেখলেন কারফিউ নামার আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, অনুভব করলেন শহর লক্ষ্য করে ছুটে-আসা ঝড়টাকে। তিনি আবার যেই বাইরে বেরুবেন বলে তৈরি, এমন সময় স্ত্রী বাড়ি ফিরে এলেন।

কর্নেল কুঁকড়োকে শোবার ঘরে নিয়ে এলেন। স্ত্রী পোশাক পালটে বসার ঘরে গেলেন জল খেতে, কর্নেল তখন ঘড়িটায় দম দেয়া সবে শেষ করেছেন, আর অপেক্ষা করছেন কখন কারফিউ জারি করে তূরী বাজে।

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?' কর্নেল জিগেস করলেন।

'এই, কাছেপিঠেই,' স্ত্রী উত্তর দিলেন। স্বামীর দিকে না তাকিয়েই গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন তিনি বেসিনে, তারপরে শোবার ঘরে ফিরে গেলেন। 'এত শিগগিরই যে বৃষ্টি নামবে, এটা কেউ আশা করেনি।' কর্নেল কোনো মন্তব্য করলেন না। যখন কারফিউ বাজল, তিনি ঘড়িটার কাঁটা এগারোটায় বসালেন, তারপর ঢাকা বন্ধ করে দিলেন, চেয়ারটা ঠেলে

ঠিক জায়গায় রেখে দিলেন। আবিষ্কার করলেন স্ত্রী জপমালা ঘোরাচ্ছেন।

'তুমি কিন্তু আমার কথায় কোনো উত্তর দাওনি,' কর্নেল বলল।

'কী?'

'ছিলে কোথায়?'

'ওখানেই ছিলুম, কথা বলছিলম', স্ত্রী বললেন। 'বাড়ি থেকে সে যে কদ্দিন বাদে বেরিয়েছি আজ!'

কর্নেল তাঁর দোলখাটিয়া টাঙিয়ে দিলেন। বাড়িটায় দরজা-জানলা বন্ধ করে কীটনাশক ছিটোলেন। তারপর বাতিটাকে মেঝেয় নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন।

'বুঝতে পারি', বিষন্ন স্বরে বললেন কর্নেল। 'খারাপ অবস্থা আরো খারাপ হয় যখন তা আমাদের দিয়ে মিথ্যে কথা বলায়।'

স্ত্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

'পাদ্রি আন্হেলের কাছে গিয়েছিলুম,' তিনি বললেন। 'আমাদের বিয়ের আংটিগুলো বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার করতে চাইছিলুম।'

'আর কী বললেন উনি, তোমাকে?'

'যে, পবিত্র জিনিস বেচাকেনা মহাপাপ।'

তাঁর মশারির তলা থেকে তিনি কথা বলেই চললেন। 'দিন দুই আগে আমি ঘড়িটা বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলুম,' তিনি বললেন। 'কারু কোনো ইচ্ছে নেই, কারণ ওরা কিস্তিতে হালফ্যাশনের সব ঘড়ি বিক্রি করছে—অন্ধকারে যাদের কাঁটা জ্বলজ্বল করে। অন্ধকারেও তুমি কটা বাজে দেখতে পাবে।' কর্নেল মনে মনে স্বীকার করলেন যে চল্লিশ বছর একসাথে জীবন কাটানো, একসাথে ক্ষুধা ভাগ করে নেয়া, একসাথে দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নেয়া—কিছুই যথেষ্ট নয়—এখনও তিনি তাঁর স্ত্রীকে পুরোপুরি জানতে পারেন নি। তাঁদের প্রেমের মধ্যে আরো কী একটা যেন পুরোনো হয়ে গেছে—তাঁর মনে হল।

'ছবিটাও ওরা চায় না', স্ত্রী বললেন। 'প্রায় সবার কাছেই ঐ একই ছবি আছে। আমি এমনকী তুরানির কাছেও গিয়েছিলুম।'

খুব তেতো লাগল কর্নেলের।

'এখন তাহলে সবাই জানে যে আমরা না-খেয়ে মরছি।'

'আমার ক্লান্ত লাগছে', স্ত্রী বললেন। 'পুরুষ মানুষ কখনও সংসারের ঝামেলাগুলো বোঝে না। কতবার আমি পাথর কুড়িয়ে এনে সেদ্ধ করেছি,

যাতে পড়শিরা বুঝতে না পারে যে আমাদের বাড়িতে অনেক দিনই হাঁড়ি চড়ানো হয় না।'

কর্নেল আহত বোধ করলেন।

'সে একেবারেই দীন দশা,' তিনি বললেন।

স্ত্রী মশারির তলা থেকে বেরিয়ে এসে দোলখাটিয়ার কাছে চলে এলেন। 'আমি এ-বাড়িতে সব বড়োমানুষি চাল, ভাল সবকিছু ছেড়ে দিতে পারি,' তিনি বললেন। তাঁর স্বর রোষে গাঢ়, ঘন হয়ে উঠল। 'ঐ মর্যাদাবোধ আর হালছাড়াভাবে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।'

কর্নেল একটা পেশীও নড়ালেন না।

'প্রত্যেকবার ভোটের পরে ওরা তোমায় কথা দেয় ঐ ছোটে ছোটো রঙিন পাখিগুলো দেবে, আর এইভাবে চলেছে কুড়ি বছর ধরে—অপেক্ষা আর অপেক্ষা। আর এ-সবের মধ্যে থেকে কী পেলুম আমরা? একটা মরা ছেলে।' স্ত্রী বলে চললেন, 'একটা মরা ছেলে ছাড়া আর কিছুই না।'

এ-ধরনের নালিশে কর্নেল অভ্যস্ত।

'আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি।'

'আর ওরা ওদের কর্তব্য করেছে—কুড়ি বছর ধরে সেনেটে হাজার পেসো করে রোজগার করে,' স্ত্রী উত্তর দিলেন। 'এই দ্যাখো না আমাদের দোস্ত সাবাসকে—দোতলা একটা বাড়িতে সব টাকা আঁটাতে পারছে না—অথচ এ-শহরে ও এসেছিল জটিবুড়ি আর টোটকা বেচতে—গলায় একটা সাপ জড়িয়ে।'

'অথচ ও এখন বহুমূত্র রোগে মরতে বসেছে,' কর্নেল বললেন।

'আর তুমি মরতে বসেছ অনাহারে,' স্ত্রী বললেন। 'এটা তোমার বোঝা উচিত মর্যাদা খেয়ে কারু পেট ভরে না।'

তাঁর কথায় বাধা দিলে বাজ আর বিদ্যুৎ। রাস্তায় একটা ফেটে পড়ল, ঢুকল শোবার ঘরে, আর খাটের তলা দিয়ে একরাশ পাথরের মতো গড়িয়ে গেল। স্ত্রী লাফিয়ে চলে এলেন মশারির কাছে, তাঁর জপের মালার জন্য।

কর্নেল হাসলেন একটু।

'জিভকে বাগ না-মানালে ও-রকমই হয়,' তিনি বললেন। 'আমি তো চিরকালই বলে এসেছি যে ভগবান আমার পক্ষে আছেন।'

বাস্তবে কিন্তু কর্নেল তিক্ততাই অনুভব করেছিলেন। পরক্ষণে বাতি নিভিয়ে দিয়ে তিনি ভাবনায় তলিয়ে গেলেন বিদ্যুৎ-ছেঁড়া এক অন্ধকারে।

আর মনে পড়ে গেল মাকোন্দো, কর্ণেল তখন নেরলাদিয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে ভেবে দশ বছর অপেক্ষা করেছেন। আধো তন্দ্রার ঘোরে তিনি দেখলেন একটা হলদে, ধূলিধূসর ট্রেন এসে দাঁড়াল—নারীপুরুষ জীবজন্তু সবাই গরমে হাঁসফাঁস করছে—অথচ এমনকী ট্রেনের ছাদেও গাদাগাদি ভিড়। সে ছিল কলার মরশুমের জ্বর।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তারা শহরটাকে আগাপাশতলা বদলে ফেলেছিল। 'আমি কেটে পড়ছি', কর্ণেল তখন বলেছিলেন। 'কলার গন্ধ আমার ভেতরটা কুরে-কুরে খাচ্ছে।' আর তিনি ফিরতি ট্রেনেই মাকোন্দো ছেড়ে এসেছিলেন, বুধবার, ২৭ জুন, ১৯০৬, বিকেল দুটো ১৮-য়। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী লেগেছিল তাঁর এটা বুঝতে, নেরলাদিয়ার আত্মসমর্পণের পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও কখনো শান্তি পান নি।

কর্ণেল তাঁর চোখ খুললেন।

'তাহলে আর এ নিয়ে ভাবার আর-কিছু নেই,' তিনি বললেন।

'কী?'

'ঐ কুঁকড়োর সমস্যাটা', কর্ণেল বললেন। 'কালই আমি ওকে দোস্ত সাবাসের কাছে নশো পেসোয় বেচে দেব।'

খাশিগুলোর হাউহাউ, তার সঙ্গে মিশে-যাওয়া সাবাসের হাউমাউ তেড়েফুঁড়ে এসে ঢুকল আপিসের জানলা দিয়ে! ও যদি আর দশ মিনিটের মধ্যে না-আসে তো আমি চলে যাবো, দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কর্ণেল নিজেকে কথা দিলেন। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন আরো কুড়ি মিনিট। যেই তিনি চলে যাবার জন্য পা বাড়াবেন, একদল কামলার সঙ্গে সাবাস তার আপিসঘরে এসে ঢুকলো। কর্ণেলের দিকে না-তাকিয়েই তাঁর সামনে সে পায়চারি করতে লাগল।

'আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে নাকি, দোস্ত?'

'হ্যাঁ, দোস্ত', বললেন কর্ণেল। 'তবে তুমি যদি এখন ব্যস্ত থাক, আমি না-হয় পরে আবার আসব।'

দরজার অন্য পাশ থেকে সাবাস তাঁর কথা শুনতেই পেলে না।

'আমি এক্ষুনি আসছি,' সে বললে।

দুপুরটা দম আটকানো। রাস্তার স্বচ্ছ গরমের হলকায় আপিসটা ঝিকিয়ে উঠেছে। গুমোটে কেমন ভেঁাতা হয়ে গিয়ে কর্ণেল আপনা থেকেই

তাঁর চোখ বুজলেন আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। সাবাসের স্ত্রী পা টিপে-টিপে ঘরে এসে ঢুকল।

'না, না, ঘুম ভাঙাবেন না, দোস্ত', সে বললে। 'আমি শুধু খড়খড়ি নামিয়ে দিতে এসেছি—আপিসটা যেন একটা নরককুণ্ড হয়ে আছে।'

কর্নেল শূন্য দৃষ্টিতে তাকে অনুসরণ করলেন। জানলা বন্ধ করে দিয়ে সে ছায়া থেকে কথা বললে।

'আপনি কি প্রায়ই স্বপ্ন ত্যাখেন না কি?'

'মাঝে-মাঝে,' উত্তর দিলেন কর্নেল, ঘুমিয়ে পড়ার জন্য ভারি লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। 'সবসময়, সবসময়, আমি স্বপ্ন দেখি যে আমি একটা মাকড়শার জালে জড়িয়ে পড়ছি।'

'আমি রোজ রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি,' সাবাসের স্ত্রী বললেন। 'এখন আমার মাথায় ঢুকেছে, স্বপ্নে যে-সব অচেনা লোক ত্যাখায় তারা আসলে কে?'

বিজলি পাখাটা সে প্লাগে লাগিয়ে দিলে। 'গত হপ্তায় আমার শিয়রের পাশে এক মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।' সে বললে, 'আমি কোনো-মতে জিগেস করেছিলাম, কে সে, আর সে বলেছিল, "এই ঘরে বারো বছর আগে আমি মারা গিয়েছিলাম।"

'কিন্তু বাড়িটা তো দু-বছর আগেও বানানো হয়নি,' বললেন কর্নেল।

'তা ঠিক,' বললে সাবাসের স্ত্রী। 'তার মানে ভূত পেত্নীরাও ভুল করে।'

পাখার ফরফর ছায়াকে নিরেট করে তুলেছে। কর্নেল কেমন অধীর বোধ করলেন, ঘুম আর এই মেয়েটার বকবকানি দুইই তাঁকে ভীষণ জ্বালাচ্ছে। সাবাসের স্ত্রী ততক্ষণে মৃত্যু থেকে পুনর্জন্মে গিয়ে পৌঁছেছে। কর্নেল বিদায় বলবার জন্য অপেক্ষা করছেন কখন সে থামে, এমন সময় সাবাস তার সর্দার কামলা নিয়ে আপিস ঘরে ঢুকল।

'আমি চার চারবার তোমার সুপ গরম করেছি,' বললে সাবাসের স্ত্রী।

'ইচ্ছে হলে দশবারও গরম করতে পার,' বললে সাবাস। 'কিন্তু এখন আমায় জ্বালিয়ো না।'

সিন্দুক খুলে সে সর্দার কামলার হাতে এক তাড়া নোট বার করে দিলে, সঙ্গে একতাড়া নির্দেশ। সর্দার কামলা গাজল খুলল, টাকা গুনবে বলে। সাবাস দেখলে কর্নেল আপিসের পেছনে বসে আছেন, কিন্তু তাতে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। সে সর্দার কামলার সঙ্গে কথাই বলে চলল।

দুজনে যখন আবার আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে, কর্ণেল সোজা হয়ে বসলেন। দরজা খোলার আগে সাবাস থমকে দাঁড়াল।

'তোমার জন্যে কী করতে পারি, দোস্ত?'

কর্ণেল দেখলেন, কামলাদের সর্দার তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

'না, কিছু না। দোস্ত,' তিনি বললেন। 'আমি শুধু তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছিলুম।'

'কী বলবে, চটপট বলো,' বললে সাবাস। 'আমার এক মিনিটও ফুরসৎ নেই।

সাবাস দরজার হাতলে হাত রেখে একটু ইতস্তত করলে। কর্ণেল অনুভব করলেন তাঁর জীবনের সব চেয়ে দীর্ঘ পাঁচ সেকেণ্ড কাটছে। তিনি দাঁতে দাঁত চাপলেন।

'এ ঐ কুঁকড়োটার ব্যাপার'। তিনি মৃদুস্বরে বললেন।

তখন সাবাস দরজা টেনে খুলল। 'কুঁকড়োর ব্যাপার', সে আওড়ালে হেসে, আর কামলাদের সর্দারকে ঠেলে হলঘরে বার করে দিলে। 'লোকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে, আর আমার দোস্ত কি না কুঁকড়োকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।' আর তারপর, কর্ণেলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে : 'ঠিক হায়, দোস্ত। আমি এক্ষুনি আসছি।'

কর্ণেল স্থাণুর মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। হলঘর থেকে দুজনের পায়ের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন শহরে চারপাশে ঘুরতে, রোববার দুপুরের তন্দ্রায় আস্ত শহর যেন টিম মেরে আছে। দরজির দোকানে কেউ নেই। ডাক্তারখানা বন্ধ। সিরিয়ার লোকটার বেসাতির ওপর কেউ নজর রাখছে না। নদী যেন ইস্পাতের একটা পাত। নদীর পাড়ে একটা লোক চারটে তেলের পিপে পরপর সাজিয়ে তার ওপর ঘুমিয়ে আছে, রোদ থেকে বাঁচবার জন্য মুখটা টুপি দিয়ে ঢাকা। কর্ণেল বাড়ি ফিরে গেলেন, এ শহরে যে তিনিই একমাত্র সচল বস্তু তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই।

আস্ত একটা ভোজ সাজিয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'আমি সব ধারে কিনে এনেছি, কথা দিয়েছি কাল ভোরেই সব টাকা শোধ করে দেব।' তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন।

খেতে খেতে কর্ণেল তাঁকে গত তিন ঘণ্টার ঘটনাগুলোর বিবরণ দিলেন। তাঁর স্ত্রী অধীরভাবে সব শুনলেন।

'মুসকিল এটাই যে, তোমার কোনো মনের জোর নেই,' শেষটায় বললেন তাঁর স্ত্রী। 'তুমি এমনভাবে গিয়ে দাঁড়াও যেন তুমি ভিক্ষে চাইছ, যখন মাথা উঁচু করে সোজা আমাদের দোস্তের কাছে গিয়ে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলা উচিত, "দোস্ত, আমি তোমার কাছে কুঁকড়োকে বিক্রি করে দেব বলে ঠিক করেছি।"

'তুমি এমনভাবে কথা বলো যে জীবন এক ঝলক দখিনা হাওয়া।' কর্নেল বললেন।

তাঁর স্ত্রী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। সেদিন সকালে তিনি ঘরদোর সাফ করেছেন, ভারি অদ্ভুত ভাবে সেজেছেন, তাঁর স্বামীর পুরোনো জুতো পায়ে, আর অয়েল ক্লথের এপ্রন গায়ে, আর মাথায় একটা কাপড় বাঁধা, কানের পাশে দুটো গিঁট। 'তোমার একফোঁটাও ব্যাবসাবুদ্ধি নেই,' স্ত্রী বললেন। 'কিছু যখন বেচতে গেছ তখন এমন মুখ করা উচিত যেন তুমি কিনতে গেছ।'

কর্নেল স্ত্রীর চেহারায় যেন ভারি মজার জিনিস খুঁজে পেলেন।

'যেমন আছ, তেমনি থাক।' তিনি হেসে বললেন স্ত্রীকে, বাধা দিয়ে। 'তোমাকে ঠিক কোয়েকার ওটের প্যাকেটের লোকটার মতো দেখাচ্ছে।'

তাঁর স্ত্রী মাথা থেকে কাপড়টা খুলে নিলেন।

'আমি সিরিয়াস কথা বলছি,' স্ত্রী বললেন। 'এক্ষুনি আমি নিজে আমাদের দোস্তের কাছে কুঁকড়োকে নিয়ে যাচ্ছি আর বাজি ধরে বলতে পারি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি নশো পেসো নিয়ে ফিরে আসব।'

'তোমার মাথাটায় আছে একটা গোল্লা,' কর্নেল বললেন। 'তুমি আগে-ভাগেই কুঁকড়োর টাকা নিয়ে বাজি ধরছ।'

স্ত্রীর জেদ ভাঙতে অনেক কষ্ট করতে হল কর্নেলকে। তাঁদের ঐ শুক্রবারের নরক যন্ত্রণা ছাড়াই আগামী তিন বছর কী করে সংসার চালাবেন, সে নিয়ে তিনি পাই-পয়সা অব্দি হিসেব করে বসেছিলেন। যা যা একেবারেই না হলে নয়, তার একটা ফর্দ তৈরি করেছিলেন তিনি, এমনকী কর্নেলের জন্য একজোড়া নতুন জুতোর কথাও তিনি ভোলেন নি। শোবার ঘরে আয়না বসাবার জন্য একটা জায়গা ঠিক করে রেখেছেন। তাঁর সব সংকল্পে এই আচমকা বাধা পড়ায় তিনি কেমন লজ্জা আর রাগের একটা মিশোল অনুভূতি অনুভব করলেন।

ছোট্ট একটা ঘুম লাগালেন স্ত্রী। ঘুম ভেঙে উঠে দেখলেন, কর্নেল বারান্দায় বসে আছেন।

'এখন কী করছ, শুনি ?' স্ত্রী জিগেস করলেন।

'আমি ভাবছি,' কর্নেল বললেন।

'তাহলেই তো সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে ও টাকা হাতে আমরা গুনতে পারব।'

বাস্তবিক কিন্তু সেদিনই বিকেলে কুঁকড়োকে বেচে দেবেন বলে কর্নেল ঠিক করে ফেলেছিলেন। সাবাসের কথাও ভেবেছেন তিনি, কখন সে তার আপিশে একা থাকবে, বিজলি পাখাটার সামনে বসে কখন সে তার রোজকার ইঞ্জেকশন নেবে। তিনি তার উত্তর তৈরি করেই রেখেছেন।

'কুঁকড়োটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও,' বেরুবার সময় স্ত্রী তাঁকে পরামর্শ দিলেন। 'তাকে চর্মচক্ষুতে দেখলে ভোজবাজির মতো কাজ দেবে।'

কর্নেল আপত্তি করলেন। মরিয়া উদ্বেগ নিয়ে স্ত্রী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা অব্দি এলেন।

'ওর আপিসে যদি আস্ত সেনাবাহিনীও বসে থাকে, তাতে কিছুই এসে যায় না,' তিনি বললেন। 'তুমি ওর হাত পাকড়ে ধোরো নশো পেসো হাতে না দেওয়া অব্দি একবারও ছেড়ো না।'

'ওরা ভাববে আমরা বুঝি কোনো ডাকাতির মতলব আটছি।'

স্ত্রী তাতে কানও দিলেন না।

'মনে রেখো, কুঁকড়োর মালিক হচ্ছ তুমি', স্ত্রী আবারও বোঝালেন, 'মনে রেখো, ও না, তুমিই ওকে অনুগ্রহ দেখাচ্ছ।'

'ঠিক আছে।'

সাবাস ছিল শোবার ঘরে, ডাক্তারের সঙ্গে। 'এই-ই আপনার সুযোগ, দোস্ত,' সাবাসের স্ত্রী বললে কর্নেলকে। 'ডাক্তার ওকে চেঞ্জে যাবার জন্য মজুত করে দিচ্ছে, বিষ্যুৎবারের আগে ও ফিরবেই না।' কর্নেল দুই পরস্পরবিরোধী টানের সঙ্গে জুঝছিলেন: কুঁকড়োকে বিক্রি করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলেন এক ঘণ্টা পরে এলেই হত, তাহলে আর সাবাসের সঙ্গে দেখা হত না।

'আমি না হয় অপেক্ষা করি,' কর্নেল বললেন।

কিন্তু সাবাসের স্ত্রী জোর করলে। সে তাঁকে শোবার ঘরে নিয়ে এল সটান, শোবার ঘরে সিংহাসনের মতো পালঙ্কটায় বসে আছে সাবাস, তার রং মরা চোখটা ডাক্তারের ওপর। ডাক্তার রোগীর মুতভরা শিশিটা

গরম করা অব্দি অপেক্ষা করলেন কর্নেল, তারপর ডাক্তার শুঁকল ঐ প্রস্রাব, সাবাসের দিকে তাকিয়ে সব ঠিক আছে, এমন একটা ভঙ্গি করলে।

'ওকে গুলি করে না-মারলে মরবে না,' কর্নেলের দিকে ফিরে ডাক্তার বললে। 'বড়োলোকদের খতম করার পক্ষে বহুমূত্র হল বেজায় ঢিমে ব্যাপার।'

'তোমার ঐ হতচ্ছাড়া ইনসুলিন ইঞ্জেকশনগুলো দিয়ে অনেক তো দেখলে,' বললে সাবাস, তার মোটা পাছাটা নাড়িয়ে। 'কিন্তু আমি বাপু শক্ত আছি—সহজে ভাঙি না', আর তারপর, কর্নেলকে:

'আরে, এসো, এসো, দোস্ত। বিকেলবেলায় তোমার খোঁজে গিয়ে টুপির ডগাটা অব্দি দেখতে পাইনি।'

'আমি যেহেতু কোনো টুপি পরি না, তাই কাউকে দেখে সেটা খুলতেও হয় না।'

সাবাস তার ধরাচুড়ো পরতে শুরু করলে। রক্তের নমুনাভরা একটা কাচের টিউব তার কোটের পকেটে রাখলে ডাক্তার। তারপর সে তার ব্যাগের জিনিসগুলো ঠিক করে সাজালে। কর্নেল ভাবলেন সে বুঝি চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

'আমি যদি তুমি হতুম ডাক্তার, তবে দোস্তের কাছে হাজার পেসোর বিল পাঠাতুম', কর্নেল বললেন। 'তাহলে ও এত ভেবে মরত না।'

'সে পরামর্শ আগেই দিয়েছি ওকে, তবে লাখ টাকার বিল,' বললে ডাক্তার। 'বহুমূত্রের সেরা ওষুধ হল দারিদ্র্য।'

'ব্যবস্থার জন্যে ধন্যবাদ,' বললে সাবাস, তার বিশাল পেটটাকে একটা যোধপুরির মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করতে করতে। 'কিন্তু ও-পরামর্শ আমি নেব না, তারপর বড়োলোক হয়ে তোমার সর্বনাশ হোক আর কি।' ডাক্তার দেখলে তার নিজের দাঁতই তার ব্যাগের চকচকে তালাটায় প্রতিফলিত হচ্ছে। কোনো অস্থিরতা না-দেখিয়ে সে ঘড়ি দেখলে। সাবাস বুট জোড়া পরে নিয়ে হঠাৎ কর্নেলের দিকে ফিরল।

'তারপর, দোস্ত, কুঁকড়োর হাল কেমন?'

কর্নেল বুঝতে পারলেন ডাক্তারও তাঁর জবাব শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তিনি দাঁতে দাঁত চাপলেন।

'তেমন কিছু-না, দোস্ত,' মৃদু স্বরে বললেন কর্নেল। 'আমি ওটা তোমার কাছে বেচতে এসেছি।'

সাবাসের বুট পরা শেষ হল।

'বেশ ভালো কথা, দোস্ত।' কোনো আবেগ না দেখিয়ে সে বললে। 'এইই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে তোমার পক্ষে।'

'ও সব ঝামেলার পক্ষে বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছি আমি,' ডাক্তারের অভেদ্য অভিব্যক্তির সামনে কর্নেল নিজের সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করলেন। 'আমার বয়েস যদি কুড়ি বছর কম হত, তাহলে আলাদা কথা ছিল।'

'আপনার বয়েস চিরকালই কুড়ি বছর কম থেকে যাবে', ডাক্তার বললে।

কর্নেল হাঁপ ছাড়লেন। সাবাস আরো কী বলে, সেজন্যে একটা জিপ লাগানো চামড়ার কোট গায়ে চাপালে, শোবার ঘর ছেড়ে বেরুবার জন্যে সে তৈরি।

'তোমার ইচ্ছে হলে আসছে হপ্তায় না-হয় এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে, দোস্ত,' কর্নেল বললেন।

'আমিও ঠিক ও-কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম,' বললে সাবাস। 'আমার হাতে এক মক্কেল আছে—সে হয়ত তোমাকে চারশো পেসো দেবে। কিন্তু সেজন্যে তো বিষ্যুৎবার অব্দি অপেক্ষা করতে হবে।'

'কত দেবে?' ডাক্তার জিগেস করলে।

'চারশো পেসো।'

'আমি শুনেছি কে যেন বলছিল তার দাম আরো অনেক বেশি', বললে ডাক্তার।

'তুমি নিজেই নশো পেসোর কথা বলছিলে,' কর্নেল বললেন। ডাক্তারের হতভম্ব ভাব দেখে তিনি একটু বল পেয়েছেন। 'সারা তল্লাটটায় ও হল সব সেরা লড়িয়ে মোরগ।'

সাবাস ডাক্তারের কথার উত্তর দিলে।

'অন্য সময় হলে যে কেউ হেসেখেলে হাজার পেসো দিত', বুঝিয়ে বললে সে। 'কিন্তু এখন, কেউই কোনো বাহাদুর মোরগকে নিয়ে লড়তে ভয় পায়। সবসময়েই ভয় আছে যে রিং থেকে বেরিয়ে এলেই গুলি খেয়ে মরবে।' কর্নেলের দিকে তাকিয়ে সে হতাশার ভঙ্গি করলে:

'এই কথাটাই তোমাকে আমি বলতে চাইছিলাম, দোস্ত।'

কর্নেল ঘাড় নাড়লেন।

'বেশ,' তিনি বললেন।

তিনি তাকে অনুসরণ করে হলঘরে এলেন। বসার ঘরে, সাবাসের স্ত্রী ডাক্তারকে আটকেছে, সে একটা ওষুধ চাইছে—'ঐ যারা হঠাৎ এসে চড়াও হয়, অথচ জানা নেই তারা আসলে কী,' তাদের জন্য একটা মোক্ষম ওষুধ। কর্ণেল আপিস ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সাবাস সিন্দুক খুলে সবগুলো পকেটে তাড়া তাড়া নোট ঠাশল, তারপর কর্ণেলের দিকে চারটে নোট বাড়িয়ে দিলে।

'এই রইল ষাট পেসো', সে বললে। 'কুঁকড়ো বিক্রি হয়ে গেলে বাকি টাকা মিটিয়ে দেব।'

কর্ণেল ডাক্তারের সঙ্গে-সঙ্গে নদীর ধারের ফিরিওয়ালাদের ঝুপড়িগুলো পেরিয়ে এলেন, বিকেলের ঠাণ্ডায় আবার সবকিছু জেগে উঠছে। সুতোর মতো স্রোত দিয়ে আখ বোঝাই একটা বজরা ভেসে চলেছে। কর্ণেলের মনে হল ডাক্তার যেন অদ্ভুত অভেদ্য হয়ে আছে।

'আর তুমি, তুমি কেমন আছ, ডাক্তার?'

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকাল।

'যথাপূর্বম,' সে বললে। 'মনে হয়, ডাক্তার দেখালে ভালো হত।'

'এ এই শীতকালটা', বললেন কর্ণেল। 'এ আমার ভেতরটা কামড়ে খায়।'

ডাক্তার এমনভাবে তাঁকে তাকিয়ে দেখল যার মধ্যে পেশাদার কোনো কৌতূহলের লেশমাত্র নেই। ঝুপড়িগুলোর সামনে বসা সব সিরিয়ানদের সে পর-পর নমস্কার করলে। ডাক্তারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে কর্ণেল কুঁকড়ো বেচা বিষয়ে নিজের মতটা বললেন।

'আর কিছু আমার করার ছিল না,' তিনি বোঝালেন। 'হতভাগা মানুষের মাংস খেয়ে বাঁচে।'

'মানুষের মাংস খেয়ে যে বাঁচে সে ঐ সাবাস,' ডাক্তার বললে। 'আমি ঠিক জানি কুঁকড়োকে ও নশো পেসোয় বেচবে।'

'তোমার তা-ই মনে হয়?'

'মনে হয় না, আমি জানি', ডাক্তার বললে। 'মেয়রের সঙ্গে তার বিখ্যাত দেশপ্রেমিক চুক্তির মতোই এ-ব্যাপারটা।'

কর্ণেল বিশ্বাস করতে অসম্মত হলেন। 'আমার দোস্ত শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাতেই চুক্তিটা করেছিল।' তিনি বললেন। 'শুধু ঐ করেই ও শহরে থাকতে পেরেছে।'

'আর এইভাবেই ও, মেয়র যখন ওর দলের সবাইকে লাথি মেরে বার ক'রে দিয়েছে, এইভাবেই ও আদ্ধেক দামে তাদের সব সম্পত্তি কিনে নিতে পেরেছে,' ডাক্তার উত্তর দিলে। পকেট হাৎড়ে চাবি না পেয়ে সে ডাক্তারখানার দরজার কড়া নাড়লে। তারপরে সে কর্ণেলের অবিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড়াল।

'অত বোকা হবেন না,' সে বললে। 'নিজের প্রাণের চেয়েও সাবাস টাকাবে বেশি ভালোবাসে।'

কর্ণেলের স্ত্রী সে-রাতে কেনাকাটায় বেরুলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সিয়ারানদের ঝুপড়িগুলো অব্দি গেলেন, তাঁর মাথায় ডাক্তারের উদ্ঘাটন ঘুরপাক খাচ্ছে।

'এখুনি ছোঁড়াগুলোকে খুঁজে বার করো, বলো যে কুঁকড়োকে বেচে দিয়েছ,' তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন। 'ওদের মিথ্যে আশায়-আশায় রাখা ঠিক হবে না।'

'আমার দোস্ত সাবাস ফিরে না আসা অব্দি কুঁকড়ো বিক্রি হবে না,' কর্ণেল উত্তর দিলেন।

কর্ণেল গিয়ে দেখলেন আলভারো বিলিয়াডের্'র আখড়ায় রুলেটের চাকা নিয়ে জুয়ো খেলছে। রোব্বার রাতে আড্ডাটা থৈ-থৈ করে। আরো গুমোট লাগে এখানে, বিশেষ পুরো দমে যখন গাঁকগাঁক করতে থাকে রেডিও। একটা মস্ত কালো অয়েল ক্লথের ওপর জ্বলজ্বলে রঙে সংখ্যা লেখা, আর টেবিলের মাঝখানটায় একটা বাক্সের ওপর হ্যাজাক জ্বলছে। কর্ণেলের মজা লাগল দেখে। আলভারো তেইশ নম্বরে বাজি ধরে হারবে বলে পণ করে বসে আছে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে খেলাটা দেখতে-দেখতে কর্ণেল লক্ষ করলেন ন-টা চক্করের মধ্যে চার চারবার এগারো নম্বর জিতেছে।

'এগারো নম্বরে বাজি ধরো,' আলভারোর কানে-কানে তিনি ফিসফিস করলেন। 'ঐ নম্বরটাই বেশি উঠছে।'

আলভারো টেবিলটাকে নিরীক্ষণ করলে। পরের চক্করে কোনো বাজি ধরলে না। সে পকেট থেকে কিছু টাকা বার করলে, সঙ্গে একটা কাগজ। টেবিলের তলা দিয়ে কাগজটা সে কর্ণেলের হাতে চালান করে দিলে।

'আগুস্তিনের কাছ থেকে এসেছে,' সে বললে।

কর্ণেল গোপন চিরকুটটা পকেটে পুরলেন। আলভারো এগারো নম্বরে অনেক টাকা বাজি ধরল।

'অল্প টাকা দিয়ে শুরু করো', কর্ণেল বললেন।

'হয়ত কেল্লা মেরে দেব এবার,' আলভারো জবাব দিলে। পাশের অনেক খেলোয়াড়ও অন্য নম্বরের বদলে এগারোতে বাজি ধরল, ততক্ষণ বিশাল চাকাটা ঘুরতে শুরু করেছে। কর্ণেলের কেমন দম আটকে এল। জীবনে এই প্রথমবার জুয়ো খেলার মোহ, উত্তেজনা আর তিক্ততা অনুভব করলেন তিনি।

পাঁচ নম্বর জিতল।

'আমি দুঃখিত', কর্ণেল লজ্জায় অধোবদন হয়ে বললেন। কী রকম একটা বেদম গ্লানিবোধ হচ্ছিল তাঁর, যখন কাঠের হাতাটা আলভারোর সব টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 'যাতে কোনো বোধ নেই, তাতে নাক গলিয়ে এ-রকমই হয় আমার।'

আলভারো তাঁর দিকে না তাকিয়েই মৃদু হাসল।

'মিথ্যে ভাববেন না, কর্ণেল। ভালোবাসায় বিশ্বাস করুন।'

যে তূরীগুলো একটা ম্যাম্বো বাজাচ্ছিল, সেগুলো হঠাৎ থেমে গেল। জুয়াড়িরা মাথার ওপর হাত তুলে যে যেদিকে পারে ছিটকে গেল। কর্ণেল একটা শুকনো তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনলেন, মুখর, ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ আওয়াজ, তাঁর পিঠে কে রাইফেল ঠেকাল। তিনি বুঝতে পারলেন পুলিশের হামলায় এসে পড়েছেন তিনি মারাত্মকভাবে, পকেটে ঐ গোপন চিরকুট। হাত না তুলেই তিনি অর্ধেক ঘুরলেন। আর তারপর তিনি, জীবনে এই প্রথমবার দেখলেন, কে তাঁর ছেলেকে গুলি করেছিল। লোকটা ঠিক তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, রাইফেলের নলটা কর্ণেলের পেটে ঠেকানো। বেটেখাটো লোকটা, ইণ্ডিয়ান দেখতে, রোদে-জলে মার খাওয়া চামড়া, আর তার নিশ্বাস যেন একটা শিশুর। কর্ণেল দাঁতে দাঁত চেপে, আস্তে রাইফেলের নলটা আঙুলের ডগা দিয়ে সরিয়ে দিলেন।

'একটু দেখি' তিনি বললেন।

দুটো গোল কুৎকুতে বাদুড় চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে; ঝলকের মধ্যে মনে হল ঐ চোখ দুটো যেন তাঁকে খেয়ে ফেলছে, চিবিয়ে হজম করে ফেলছে, আর পরক্ষণেই আবার বার করে দিয়েছে।

'আপনি যেতে পারেন, কর্ণেল।'

এ যে ডিসেম্বর, তা বোঝবার জন্য জানলা খোলবারও দরকার হয় না তাঁর। হাড়ে মজ্জায় তা তিনি টের পেলেন, যখন কুঁকড়োর ছোটোহাজারির জন্যে

ফালটা কাটছিলেন। তারপর তিনি দরজা খুললেন, আর বারান্দার দশাটা তাঁর অনুভূতিকে সমর্থন করল। চমৎকার দেখাচ্ছে বারান্দাকে, ঘাস, গাছপালা, আর ছোট্ট পায়খানাটা যেন স্বচ্ছ হাওয়ায় ভাসছে, মাটি থেকে এক মিলিমিটার ওপরে।

স্ত্রী বিছানাতেই শুয়ে রইলেন বেলা নটা অব্দি। যখন তিনি রান্নালয়ে অবশেষে দেখা দিলেন, কর্নেল ততক্ষণে ঘরদোর সাফ করে কুঁকড়োর চারপাশে ঘিরে বসা বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছেন। উনুনের কাছটায় যাবার জন্যে তাঁকে একটু ঘুরে যেতে হল।

'বেরো সামনে থেকে,' স্ত্রী চ্যাঁচালেন। কুঁকড়োর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালেন তিনি। 'ঐ অলুক্ষুণে পাখিটাকে যে কবে বিদেয় করতে পারব, জানিনে।'

কুঁকড়োকে নিয়ে স্ত্রীর বদমেজাজকে কর্নেল কোনো আমলই দিলেন না। কুঁকড়োকে নিয়ে রাগ করার কিছু নেই। সে এখন লড়াইয়ের কায়দা শেখবার জন্য তৈরি। তাঁর গলা, আর পালক বসানো লাল উরু, তার করাতের মতো মোরগফুল,—সব মিলিয়ে দীঘল চেহারা কুঁকড়োর, কেমন যেন অসহায় লাগে তাকে।

'কুঁকড়োর কথা ভুলে গিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছাখো,' বাচ্চারা চলে গেলে কর্নেল বললেন। 'এ রকম একটা সকালবেলায় ছবি তোলবার ইচ্ছে করে।'

স্ত্রী জানলা দিয়ে ঝুঁকে তাকালেন বটে, কিন্তু মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। 'গোলাপ গাছ লাগালে হয়,' তিনি বললেন, উনুনের কাছে ফিরে যেতে যেতে। কর্নেল দাড়ি কামাবার জন্যে আয়নাটা টাঙালেন।

'গোলাপ গাছ লাগাতে ইচ্ছে করলে, লাগাও,' তিনি বললেন। আয়নাটার দুলুনির সঙ্গে তাল রাখবার চেষ্টা করলেন কর্নেল।

'শুওরগুলো গোলাপ খেয়ে ফ্যালে,' স্ত্রী বললেন।

'সে তো আরো ভালো,' বললেন কর্নেল। 'গোলাপফুল খেয়ে মোটা হওয়া শুওর খেতে নিশ্চয়ই আরো ভালো লাগে।'

আয়নার মধ্যে তাকিয়ে স্ত্রীকে খুঁজলেন কর্নেল, দেখলেন যে এখনও স্ত্রীর মুখে সেই বদমেজাজ লেগে আছে। উনুনের আঁচে তাঁর মুখটাকে দেখাচ্ছে যেন একই আগুনে বানানো। অজান্তেই তাঁর চোখ স্ত্রীর মুখে আটকে গেল। কর্নেল হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দাড়ি কাটলেন,

অত বছর যেমন কেটেছেন। তাঁর স্ত্রী চুপচাপ অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবছেন।

'কিন্তু আমি গোলাপগাছ লাগাতে চাই না,' স্ত্রী বললেন।

'বেশ,' কর্ণেল বললেন। 'তবে লাগিও না।'

ভালো লাগছে তাঁর। ডিসেম্বর তাঁর পেটের উদ্ভিদগুলোকে শুকিয়ে কুঁচকে দিয়েছে। নতুন জুতো পায়ে লাগাতে গিয়ে তাঁর একটা আশাভঙ্গ হল। কিন্তু কয়েক বার চেষ্টার পর তিনি বুঝতে পারলেন চেষ্টা করাই বৃথা। তো, পেটেন্ট চামড়ার জুতো জোড়াই পরলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী বদলটা লক্ষ্য করলেন।

'নতুন জুতো যদি না-পরো কখনও, তবে আঁট ভাবটা কাটবে কী করে?' স্ত্রী বললেন।

'ও তো খোঁড়াদের জুতো', কর্ণেল প্রতিবাদ জানালেন। 'একমাস পরে ঢিলে করা জুতোই ওদের বিক্রি করা উচিত।'

আজ কেন যেন তাঁর মনে হচ্ছে চিঠিটা আসবে—বিকেলবেলায়। এই পূর্ববোধ নিয়েই তিনি রাস্তায় বেরুলেন। এখনও যখন লঞ্চ আসার সময় হয়নি, তিনি সাবাসের অফিস ঘরে বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ওরা তাকে জানালে যে সোমবারের আগে সে ফিরবে না। এই অসুবিধেটা তিনি আশা করেন নি, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর সব হারালেন না। 'আগে হোক, পরে হোক, আসতে তো তাকে হবেই' নিজেকে বোঝালেন তিনি, তার পর জাহাজ ঘাটের দিকে চললেন। মুহূর্তটা চমৎকার, এখনও নিষ্কলুষ প্রাঞ্জলতার এক মুহূর্ত।

'সারা বছরটারই ডিসেম্বর হওয়া উচিত,' মৃদুস্বরে তিনি বললেন, সেরিয়ান মোসেস-এর দোকানে বসে। 'নিজেকে মনে হয় যেন কাচে তৈরি।'

তার প্রায় ভুলে যাওয়া আরবীতে ভাবনাকে তর্জমা করবার একটা চেষ্টা করলে মোসেস। সে এক গোবেচারা আরব, কান অব্দি মসৃণ ছিমছাম চামড়ায় মোড়া, তার নড়াচড়ার ভঙ্গি সবসময় কেমন একটা ডুবন্ত মানুষের মতো অলবভ্যে। সত্যি বলতে, তাকে দেখেই মনে হয়, এই বুঝি তাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

'আগে তো তা-ই ছিল,' সে বললে। 'এখনও যদি আগের মতো হত তো আমার বয়েস হত আটশো সাতানব্বুই বছর। আর আপনার?'

'পঁচাত্তর', বললেন কর্ণেল, তাঁর চোখ পিছু নিয়েছে পোস্টমাস্টারের।

আর শুধু তখনই তিনি আবিষ্কার করলেন সার্কাসটা। ডাকনৌকোর ছাতের তালিলাগানো তাঁবুটা চিনতে পারলেন তিনি একগাদা রঙিন জিনিসের মাঝখানে। এক ঝলকের জন্য পোস্টমাস্টারকে হারালেন তিনি চোখ থেকে, অন্যান্য লঞ্চের ওপর বড় বড় খাঁচায় জানোয়ারগুলোকে তাঁর চোখ খুঁজে বেড়াল। তাদের তিনি খুঁজে পেলেন না।

'সার্কাস,' তিনি বললেন। 'দশ বছরে এই প্রথম একটা সার্কাস এল।'

সিরিয়ান মোসেস তাঁর খবরটা যাচাই করে দেখলে। ভাঙা-ভাঙা আরবি আর ইস্পানি মিশিয়ে সে তার স্ত্রীকে কী বললে। স্ত্রী দোকানের পেছন থেকে উত্তর দিলে। সে নিজের মনেই কী একটা মন্তব্য করলে, তারপর কর্নেলকে তাঁর উদ্বেগটা তর্জমা করে বোঝালে।

'আপনার বেড়ালটা লুকিয়ে রাখুন, কর্নেল। ছেলেরা নয়তো সেটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে সার্কাসওলার কাছে বেচে দেবে।'

কর্নেল পোস্টমাস্টারের পেছন নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

'এ কোনো বুনো জানোয়ারের খেলা নয়,' তিনি বললেন।

'তাতে কিছু এসে যায় যায় না', সিরিয়ান বললে। 'ঐ যারা দড়ির ওপর হাঁটে, ওরা বেড়াল খায়, যাতে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় না-ভাঙে।'

পোস্টমাস্টারকে অনুসরণ করে ঘাটের ঝুপড়িগুলো পেরিয়ে তিনি প্লাজায় এসে পড়লেন। সেখানে মোরগের লড়াইয়ের বিকট চ্যাঁচামেচি তাঁকে তাজ্জব করে দিলে। কে একজন পাশ দিয়ে যেতে-যেতে তাঁর কুঁকড়ো সম্বন্ধে কী-একটা মন্তব্য করলে। শুধু তখনই তাঁর মনে পড়ল যে আজই হল মহড়ার দিন।

ডাকঘরটা তিনি পেরিয়ে এলেন। পরক্ষণেই তিনি রিঙের খ্যাপা আবহাওয়ার মধ্যে ডুবে গেলেন পুরোপুরি। তিনি দেখলেন, রিঙের মাঝখানে তাঁর কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে, একা. অসহায়, ছেঁড়া কাঁপড়ে বাঁধা তার পায়ের কাতান, আর তার পা যেভাবে কাঁপছে তাতে ভয়ের মতো কিছু-একটা দেখা যাচ্ছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী হল একটা বিষণ্ণ ছাইরঙা মোরগ।

কোনো অনুভূতিই হল না কর্নেলের। পর-পর অনেকগুলো আক্রমণ হল, একই ভঙ্গিতে, একই রকম। এক সোৎসাহ জয়ধ্বনির মধ্যে ঝলকের জন্য পালক, পা আর ঘাড়ে ঘাড়ে মাখামাখি। পাটাতনের বেড়ায় ঘা খেয়ে একটা ডিগবাজি খেয়েই প্রতিদ্বন্দ্বী ফিরে এল লড়াইতে। কর্নেলের কুঁকড়ো তাকে

আক্রমণ করলে না। সে শুধু সব হামলাকে ঠেকাল, আবার ঠিক একই জায়গায় পড়ে গেল। কিন্তু এখন আর তার পা কাঁপছে না।

এরনান বেড়াটা টপকে নেমে পড়ল রিঙে, দু-হাতে তাকে তুলে ধরল, আর চারপাশের ভিড়কে তুলে দেখাল তাকে। হাততালি আর জয়ধ্বনির সে কী তুলকালাম বিস্ফোরণ। কর্ণেল লক্ষ্য করে দেখলেন লড়াইয়ের তীব্রতা আর জয়ধ্বনির উৎসাহের মধ্যে ফারাকটা। সবটা তাঁর একটা প্রহসন বলে মনে হল—স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, সচেতনভাবেই—মোরগরাও নিজেদের বাঁধা দিয়ে দিয়েছে।

একটু নাক সিঁটকোনো কৌতূহলের খোঁচায় তিনি গোল রিংটাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। উত্তেজিত একটা ভিড় রিংয়ের দিকে নেমে আসছে। কর্ণেল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন তপ্ত, উৎকণ্ঠিত, ভীষণ সজীব মুখগুলোকে। এরা নতুন লোক। শহরের যত নবাগত, সবাই। অলুক্ষণে আশঙ্কার সঙ্গে তাঁর স্মৃতির কিনার থেকে মুছে যাওয়া একটা মুহূর্ত যেন আবার সজীব হয়ে উঠেছে তাঁর মধ্যে। তারপর তিনি বেড়া টপকে, ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন রিঙের দিকে। আর এরনানের শান্ত চোখ দুটির সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। চোখের পাতা না-ফেলে তাঁরা পরস্পরকে তাকিয়ে দেখলেন।

'নমস্কার, কর্ণেল।'

কর্ণেল তাঁর হাত থেকে কুঁকড়োকে নিয়ে নিলেন। 'নমস্কার', মৃদুস্বরে বললেন তিনি। এবং আর-কিছুই তিনি বললেন না—কারণ জীবটার উষ্ণ গভীর বুকের শব্দ তাঁর মধ্যে শিহরণ তুলে দিয়েছে। তাঁর মনে হল আগে কখনও এমন-কোনো জ্যান্ত জিনিস হাতে করে নেননি।

এরনান একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, 'আপনি বাড়ি ছিলেন না।'

এক নতুন জয়ধ্বনি তাঁকে থমকে দিলে। কর্ণেলের কেমন ভয় করল। আবার তিনি ভিড় ঠেলে এগুলেন, কারু দিকে না তাকিয়েই। হাততালি আর জয়ধ্বনি তাঁকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে, তারপর কুঁকড়োকে কোলে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন রাস্তায়।

সারা শহর—যত গরিবগুরবো লোক—বেরিয়ে এল তাঁকে দেখতে. রাস্তা দিয়ে চলেছেন কর্ণেল, পেছনে বাচ্চাদের পাল। একটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়েছিল এক অতিকায় নিগ্রো, গলায় একটা সাপ জড়ানো, কোনো লাইসেন্স ছাড়াই সে প্লাজায় জটিবুড়ি বিক্রি করছে। জাহাজঘাটা থেকে

ফেরা এক মস্ত জটলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে তার বাকতাল্লা। কিন্তু কর্ণেল যখন কুঁকড়োকে কোলে নিয়ে পালা দিয়ে চলে গেলেন, লোকের মনোযোগ পড়ল তাঁর ওপর। বাড়ি ফেরার রাস্তা কোনোদিনই এমন লম্বা ঠেকেনি আগে।

কোনো খেদ নেই তাঁর। দীর্ঘদিন ধরে শহরটা যেন পড়েছিল টিম মেরে, দশ বছরের ইতিহাস তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়েছিল। সেই বিকেলে—চিঠি বিহীন আরো একটা শুক্রবারে—লোকে জেগে উঠেছে নিঝুমপুরীতে। কর্ণেলের মনে পড়ে গেল অন্য এক যুগ। নিজেকে তিনি দেখতে পেলেন একটা ছাতার তলায়, বৃষ্টি সত্ত্বেও সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে একটা খেলা দেখছেন। তাঁর মনে পড়ে গেল দলের নেতাদের, নিখুঁত সাজপোশাক গায়ে, তাঁর বাড়ির বারান্দায় বাজনার তালে-তালে পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন নিজেদের। তাঁর পেটের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে পেতলের ঢাকের শব্দটা আবার যেন কাতরভাবে অনুভব করলেন তিনি।

জাহাজঘাটার সমান্তর রাস্তাটা ধরে তিনি হাঁটছেন, আর, সেখানেও, দেখলেন উত্তেজিত ভোটের দিনের মানুষ জন, কতকাল আগেকার। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সার্কাস দলের নামা। একটা তাঁবুর মধ্য থেকে কে এক মেয়ে কুঁকড়ো সম্বন্ধে কী যেন বললে চেঁচিয়ে। তিনি হেঁটে চললেন বাড়িমুখো, আত্মমগ্ন, ছেঁড়া-ছেঁড়া ছড়ানো কথা কানে আসছে এখনও, যেন রিঙের মধ্যকার জয়ধ্বনির রেশ এখনও তাড়া করে আসছে তাঁকে।

বাড়ির দরজায় এসে বাচ্চাদের তিনি বললেন:

'তোরা সব বাড়ি যা', বললেন তিনি, 'যে ভেতরে আসবে, তাকে আচ্ছা ঠ্যাঙানি দেব।'

তিনি দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন, সোজা চলে গেলেন রান্নাঘরে। তাঁর স্ত্রী ফোঁপাতে-ফোঁপাতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'ওরা জোর করে নিয়ে গিয়েছিল,' স্ত্রী বললেন, ফোঁপাতে ফোঁপাতে। 'আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, কেউ কুঁকড়োকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না—কতবার বললুম।' কর্ণেল চুল্লির পায়ার সঙ্গে কুঁকড়োকে বেঁধে রাখলেন। বাটিটায় জল পালটে দিলেন, স্ত্রীর কাতর গলা তাঁকে তাড়া করে ফিরছে।

'ওরা বললে আমাদের মৃতদেহ মাড়িয়েই নিয়ে যাবে', স্ত্রী বললেন। 'ওরা বললে কুঁকড়ো নাকি আমাদের নয়—বরং সারা শহরের।'

যখন কুঁকড়োর যত্ন শেষ হল, শুধু তখনই কর্ণেল স্ত্রীর মুখোমুখি হলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন, অবাক না হয়েই, যে তাঁর মধ্যে অনুতাপ বা অনুকম্প, কিছুরই কোনো অনুভূতি নেই।

'ওরা ঠিকই করেছিল,' শান্তস্বরে তিনি বললেন। আর তারপর, নিজের পকেট হাৎড়ে, তলহীন মধুর সুরে বললেন :

'কুঁকড়োকে বিক্রি করা হবে না।'

স্ত্রী তাঁকে অনুসরণ করে এলেন শোবার ঘরে। স্বামীকে তাঁর পুরোপুরি একটা মানুষ বলে মনে হল, কিন্তু যেন অস্পৃশ্য মানুষ, যেন তাঁকে তিনি দেখছেন সিনেমার পর্দায়। কর্ণেল জামা রাখার খুপরিটা থেকে একতাড়া নোট বার করে নিলেন, তার সঙ্গে যোগ করে দিলেন নিজের পকেটে যা-কিছু ছিল, তারপর পুরোটা গুনলেন, তারপর সব আবার খুপরিটায় রেখে দিলেন।

'দোস্ত সাবাসকে ফিরিয়ে দেবার জন্য উনত্রিশ পেসো রয়েছে', তিনি বললেন। 'পেনসন যখন আসবে, বাকিটা তাকে দেয়া হবে।'

'আর যদি তা না আসে ?' স্ত্রী জিগেস করলেন।

'আসবেই।'

'কিন্তু, যদি, না আসে ?'

'তো তাহলে বাকি টাকা ও পাবে না।'

নতুন জুতোজোড়াকে খুঁজে পেলেন খাটের তলায়। খুপরিটা থেকে জুতোর বাক্স বার করে আনলেন, জুতোর তলি মুছলেন ন্যাকড়া দিয়ে, তারপর জুতোজোড়া বাক্সে ভরে দিলেন, ঠিক যে রকমভাবে রোববার রাতে তাঁর স্ত্রী জুতোজোড়া কিনেছিলেন। স্ত্রী একবারও নড়লেন না।

'জুতোজোড়াও ফিরে যাবে,' কর্ণেল বললেন। 'দোস্তের জন্য আরো পনেরো পেসোর ব্যবস্থা হল।'

'ওরা আর ফিরিয়ে নেবে না', স্ত্রী বললেন।

'নিতেই হবে,' কর্ণেল উত্তর দিলেন। 'আমি শুধু দু বার পায়ে দিয়েছি।'

'তুরানিদের মগজে ও সব কথা ঢোকে না,' স্ত্রী বললেন।

'ঢোকাতেই হবে।'

'আর যদি না ঢোকে ?'

'তবে ঢুকবে না।'

না-খেয়েই শুয়ে পড়লেন দুজনে। কর্ণেল অপেক্ষা করলেন কখন তাঁর স্ত্রীর জপ শেষ হয়, তারপর বাতি নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর ঘুম এল না। সিনেমার শ্রেণীভাগ করে বাজা ঘন্টার শব্দ কানে এল, আর যেন সঙ্গে-সঙ্গেই —তিন ঘন্টা পরে—এল কারফিউ-এর তূরী। রাতের হিম হাওয়াতে স্ত্রীর বুকের ঘর্ঘর কেমন যন্ত্রণাময় শোনাল। কর্ণেলের চোখ তখনও খোলা ছিল, যখন স্ত্রী শান্ত, আপস করা স্বরে বললেন:

'তুমি জেগে আছ।'

'হ্যাঁ।'

'একটু যুক্তি দিয়ে বুঝে দেখার চেষ্টা করো', স্ত্রী বললেন। 'কালকেই দোস্ত সাবাসের সঙ্গে কথা বলো।'

'ও সোমবারের আগে ফিরবে না।

'আরো ভালো', বললেন স্ত্রী। 'তাহলে তো ওকে কী বলবে সে ভাবতে তুমি তিন-তিনটে দিন পেয়ে যাবে।'

'কিছুই ভাবার নেই,' কর্ণেল বললেন।

অক্টোবরের বীভৎস গুমোটের জায়গায় বেশ একটা মধুর হিমেল আমেজ লেগে আছে হাওয়ায়। টিট্টিভদের সময়সূচীর মধ্যে কর্ণেল আবার চিনতে পারলেন ডিসেম্বরকে। যখন দুটো বাজল, তখনও তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন নি। কিন্তু তিনি এটাও জানেন যে তাঁর স্ত্রীও জেগে আছেন। তিনি দোলখাটিয়ায় পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করলেন।

'তুমি ঘুমোতে পারছ না,' স্ত্রী বললেন।

'না।'

এক ঝলক ভাবলেন তাঁর স্ত্রী।

'অমন করার মতো অবস্থা আমাদের নয়', স্ত্রী বললেন। 'শুধু একবার ভাবো এক সঙ্গে চারশো পেসো কতগুলো টাকা।'

'পেনশন আসতে আর দেরি নেই', কর্ণেল বললেন।

'তুমি পনেরো বছর ধরে এই একই কথা বলে আসছ।'

'সেই জন্যেই', কর্ণেল বললেন, 'আর বেশি দেরি হবে না।'

স্ত্রী চুপ করে গেলেন। কিন্তু আবার যখন তিনি কথা বললেন, কর্ণেলের মনে হল কথার ফাঁকে সময় যেন একফোঁটাও এগোয় নি।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ও টাকা কখনো আসবে না', স্ত্রী বললেন।

'আসবে।'

'আর যদি না আসে ?'

উত্তর দেবার জন্য স্বর খুঁজে পেলেন না কর্ণেল। কুঁকড়োর প্রথম ডাকে বাস্তব তাঁকে আঘাত করল, কিন্তু তিনি আবার একটা ঘন, নিরাপদ, অনুতাপহীন ঘুমে তলিয়ে গেলেন। যখন তাঁর ঘুম ভাঙল, সূর্য ততক্ষণে আকাশের উঁচুতে উঠে এসেছে। তাঁর স্ত্রী তখনও ঘুমোচ্ছেন। কর্ণেল নিয়মমাফিক তাঁর সকাল বেলার কাজগুলো সব এক-এক করে সারলেন, অবশ্য ক্রমটা দু-ঘণ্টা পেছিয়ে আছে, আর অপেক্ষা করতে লাগলেন স্ত্রী কখন ছোটোহাজারিতে আসবেন।

জেগে উঠে স্ত্রী আদৌ কোনো কথা বলতে চাইলেন না। তাঁরা এক পেয়ালা কালো কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন, এক টুকরো পনির আর মিষ্টি রোলও খেয়েছেন। সারা সকালটা তিনি দরজির দোকানে কাটিয়ে দিলেন। একটার সময় বাড়ি ফিরে দেখলেন বেগোনিয়ার ঝাড়ের মধ্যে বসে স্ত্রী জামাকাপড় রিফু করছেন।

'যাবার সময় হল,' কর্ণেল বললেন।

'কোনো খাবার নেই।'

কর্ণেল কাঁধ ঝাঁকালেন। বারান্দার দেয়ালের ফোকরগুলো বুজিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন তিনি—বাচ্চারা যাতে রান্নাঘরে ঢুকতে না-পারে। যখন হল ঘরে ফিরে এলেন, টেবিলে খাবার অপেক্ষা করছে।

খেতে-খেতে কর্ণেল বুঝতে পারলেন তাঁর স্ত্রী কান্নায় ভেঙে না পড়ার জন্য ভীষণ চেষ্টা করছেন। সেটা অবশ্যই তাঁকে আতঙ্কিত করে তুলল। তিনি তাঁর স্ত্রীর ধাত জানেন, স্বভাবতই তা কঠিন, আর চল্লিশ বছরের তিক্ততায় তা আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। ছেলের মৃত্যুও তাঁর মধ্য থেকে একফোঁটা চোখের জল নিংড়ে বার করতে পারেনি।

তিনি সোজাসুজি তিরস্কার করা চোখে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকালেন। স্ত্রী ঠোঁট কামড়ে, জামার হাতায় চোখের জল মুছলেন, তারপর খেতে লাগলেন।

'তোমার কোনো বিবেচনা নেই,' স্ত্রী বললেন।

কর্ণেল কোনো কথা বললেন না।

'তুমি স্বেচ্ছাচারী, জেদী, অবিবেচক,' স্ত্রী বললেন আবার। রেকাবির ওপর ছুরি আর কাঁটা আড়াআড়ি করে রাখলেন তিনি, কিন্তু পরক্ষণেই কুসংস্কারবশত সেগুলো আলাদা করে ভুলটা শোধরালেন। 'সারা জীবন

ধরে নোংরা খেয়ে শেষে কী দেখলুম—না, একটার কুঁকড়োর চেয়েও আমার কথা কেউ কম ভাবে।'

'এ-কথা আলাদা', কর্নেল বললেন।

'একই কথা', স্ত্রী উত্তর করলেন। 'তোমার বোঝা উচিত যে আমি মরতে বসেছি। এই যে অসুখটা আমার, সে কোনো অসুখই নয়, তিলে তিলে মৃত্যু।'

কর্নেল খাওয়া শেষ না-করে আর একটা কথাও বললেন না।

'ডাক্তার যদি গ্যারান্টি দিতে পারে যে কুঁকড়োকে বিক্রি করলেই তোমার হাঁপানি সেরে যাবে, আমি তবে এক্ষুনি তাকে বিক্রি করে দেব,' কর্নেল বললেন। 'কিন্তু তা যদি না হয়, তবে না।'

সেদিন বিকেলে কুঁকড়োকে তিনি রিঙের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন স্ত্রীর আবার টান উঠছে। তিনি হলের মধ্যে পায়চারি করছেন, ঘরের এ-মাথা থেকে ও মাথা, তাঁর চুল পিঠে এলিয়ে আছে, হাত দুটো দুদিকে ছড়ানো, ফুশফুশের মধ্য থেকে দম ফেলবার চেষ্টা করছেন। সন্ধে হওয়া অবদি ওখানেই রইলেন স্ত্রী। তারপর তিনি শুতে চলে গেলেন, স্বামীর সঙ্গে একটা কথাও না বলে।

কারফিউ নামার একটু পরে অব্দি তিনি জপ করে গেলেন। তারপর কর্নেল বাতি নেভাবার জন্য উদ্যোগ করতেই তিনি বাধা দিলেন।

'আমি অন্ধকারে মরতে চাই না,' তিনি বললেন।

কর্নেল বাতিটা মেঝেয় নামিয়ে রাখলেন। কী রকম অবসন্ন লাগতে শুরু করেছে তাঁর। যদি সবকিছু ভুলে যেতে পারতেন একবার, যদি একটানা চুয়াল্লিশ দিন ঘুমিয়ে কাটাতে পারতেন, আর জেগে উঠতে পারতেন ২০শে জানুয়ারি বেলা তিনটেয়, রিঙের মধ্যে, ঠিক যখন কুঁকড়োকে লেলিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু স্ত্রীর অনিদ্রায় তাঁর ভয় ভয় করল।

'সব সময়েই সেই একই কাশুন্দি,' স্ত্রী শুরু করলেন পরক্ষণে। 'আমরা না-খেয়ে থাকব, যাতে অন্যরা খেতে পারে। চল্লিশ বছর ধরে ঐ এক গল্প।'

কর্নেল চুপ করে রইলেন, শেষটায় স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন তিনি জেগে আছেন কিনা। তিনি উত্তর দিলেন যে জেগে আছেন। মসৃণ, তরতরে নিখুঁত স্বরে স্ত্রী বলে চললেন।

'কুঁকড়ো নিয়ে বাজি ধরে সবাই জিতবে, কেবল আমরা ছাড়া। শুধু আমাদেরই বাজি ধরার মতো একটা কানাকড়িও নেই।'

'কুঁকড়োর মালিক শতকরা কুড়ি ভাগ পাবে।'

'যখন তুমি ওদের জন্য খেটে খেটে ভোটের সময় পিঠটা ভেঙেছিলে, তখনও তোমার একটা চাকরি পাবার কথা ছিল,' স্ত্রী উত্তর দিলেন। 'গৃহযুদ্ধের সময় যখন গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলে, তখনও কথা ছিল যে যুদ্ধের পর তুমি একটা ভাতা পাবে। এখন সবাই যে যার অখের গুছিয়ে নিয়েছে, আর তুমি মরতে বসেছ অনাহারে, তিলে তিলে, একা-একা।'

'আমি তো একা নই,' কর্ণেল বললেন।

তিনি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘুম তাঁকে দখল করে বসল। স্ত্রী একটানা কথা বলতে বলতে এক সময় টের পেলেন যে স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন তিনি মশারির তলা থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারেই বসার ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। সেখানেও তিনি কথা বলে চললেন, একটানা। কর্ণেল ভোরবেলায় তাঁকে ডাকলেন।

দরজায় এসে দাঁড়ালেন স্ত্রী, ভূতের মতো, নিভু নিভু বার্তির আলোয় তলার দিকটা দেখা যায়। মশারির ভেতর ঢোকবার আগে তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু কথা তার থামল না।

কর্ণেল বাধা দিলেন। 'আমরা একটা কাজ করতে যাচ্ছি।'

'একমাত্র যা আমরা করতে পারি সে ঐ নচ্ছার কুঁকড়োটাকে বেচে দেওয়া,' বললেন স্ত্রী।

'আমরা ঘড়িটাও বিক্রি করে দিতে পারি।'

'ওরা ও ঘড়ি কিনবে না।'

'কালকেই আমি দেখব আলভারো চল্লিশটা পেশো দেবে কি না।'

'সে দেবে না।'

'তাহলে আমরা ছবিটা বেচে দেব।'

স্ত্রী যখন আবার কথা বললেন, তখন তিনি আবার মশারির বাইরে। কর্ণেল তাঁর নিশ্বেসের গন্ধ পেলেন ওষুধের গন্ধে ভরা।

'ওরা ও ছবি কিনবে না,' স্ত্রী বললেন।

'দেখাই যাক!' নরম সুরে বললেন কর্ণেল, স্বরে একফোঁটা বদল নেই। 'এবার, ঘুমোতে যাও। কাল যদি কিছু বিক্রি করতে না পারি তো অন্য উপায় ভাবা যাবে।'

তিনি চোখ খুলে রাখবেন বলেই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ঘুম তাঁর সংকল্পকে হারিয়ে দিল। তিনি যেন একটা কিছুর তলায় তলিয়ে গেলেন,

দেশকালের বাইরে একটা কিছু, যেখানে তাঁর স্ত্রীর কথাগুলোর তাৎপর্য ভিন্ন রকম। কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলেন তাঁকে কেউ কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে।

'কথা বলো। জবাব দাও আমার।'

কর্ণেল ঠিক বুঝতে পারলেন না এ কথা তিনি শুনলেন কখন—জাগরণে, না ঘুমের মধ্যে। ভোর ফুটি-ফুটি করছে। জানলাটা দেখা যাচ্ছে রোববারের সবুজ প্রাঞ্জলতায়। তাঁর মনে হল তাঁর জ্বর হয়েছে। তাঁর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল, মাথার মধ্যেটা সাফ করবার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হল তাঁকে।

'কী করব আমরা, কিছু যদি বিক্রি করতে না-পারি,' স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আবার।

'ততদিনে জানুয়ারির বিশে এসে যাবে,' কর্ণেল বললেন, পুরোপুরি সজাগ। 'সেদিন বিকেলেই ওরা শতকরা কুড়িভাগ বখরা দেবে।'

'যদি কুঁকড়োটা জেতে,' বললেন স্ত্রী। 'কিন্তু যদি সে হেরে যায়? সে যে হারতে পারে, এটা তোমার মাথায় ঢোকে নি।'

'এ হচ্ছে এমন এক কুঁকড়ো, যে কখনো হারে না'

'কিন্তু, ধরো, ও হারল।'

'সে বিষয়ে ভাবার জন্য চুয়াল্লিশটা দিন আছে এখনও', কর্ণেল বললেন।

অবশেষে স্ত্রী তার ধৈর্য হারালেন।

'আর তদ্দিন আমরা কী খাব?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কর্ণেলের ফ্লানেলের রাত জামার কলার চেপে ধরলেন তিনি। জোরে ঝাঁকুনি দিলেন তাঁকে।

পঁচাত্তর বছর লাগল কর্ণেলের—তার জীবনের পঁচাত্তরটা বছর, পলের পর পল—এই মুহূর্তটায় পৌঁছুতে। নিজেকে শুদ্ধ লাগল তাঁর, প্রাঞ্জল লাগল, অপরাজেয়, যখন তিনি উত্তর করলেন:

'গু।'

(শেষ)

কমরেড লাহিড়ী-কে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কথা ছিল, দাঁতে দাঁত চেপে
নিতে হবে সকল প্রহার,
কথা ছিল, মারের বদলে
ফিরিয়ে দিতেই হবে মার,
কথা ছিল, প্রসারিত হয়ে
ছুঁতে হবে বিশাল স্বদেশ,
কথা ছিল, নানা পথে ঘুরে
পাবো সে-ঠিকানা শেষমেশ।

কথা ছিল, আরও কথা ছিল,
তুমিও তো দিয়েছো সময়,
আমাদেরই বড় বেশি ঘুম
ভাঙে কোন পড়ন্তবেলায়।
অপরাধী ছায়ার আড়ালে
তবু যদি জেগে ওঠে গ্রাম,
যতই নারাজ হও—জানি
দূর থেকে পাঠাবে সেলাম।

সময় ধরেছে অনুপূর্বের স্মৃতি

সিদ্ধেশ্বর সেন

সময় ধরেনি অনুপূর্বের
স্মৃতি !
এত হেঁটে-যাওয়া
ছ'ড়ে-যাওয়া পায়ে পায়ে
জয় তুলে নিয়ে
পরাজয়-ও নিয়ে ভালে
প্রমথের মতো তিনটি নয়নে
দৃষ্টি
একটি জীবন ইতিহাসে পায়
আমরণ সংগতি।

এত কী মিথ্যা জমেছিল
এই কালে
তাই ডমরু ও পদপাতে
নড়ে সৃষ্টি
শ্মশানে-মশানে
উড়িয়ে-ছড়িয়ে, ছাইয়ে—

এই মন্থন দেখেছি কখনো
যুগান্তে দাবানলে
খাণ্ডবদাহে অগ্নি
বীর-কে পরায় রণবেশ,—
পেতে প্রজন্মশেষে
ক্রান্তি !!

এই চলা দীর্ঘ, যতিহীন

শুভ বসু

ওই তিনি একেবারে চলে যাচ্ছেন।
কিছু স্মৃতি আগুনের ফুলকির মত
পথে, পথের ত্নপাশে
মানুষজনের মন ক্রমাগত দগ্ধায়,

মনে পড়ে
লড়িয়ে মুখের ভিড়ে তাঁর মুখ বিদ্যুৎশিখায়
দিগন্ত চেনাত, আর দগ্ধরেখা প্রান্তরের দায়
খুব বেশি বড় ব'লে মনে হ'য়ে গিয়ে
ঘর ছেড়ে ঝঞ্চায় অনেকেই চ'লে গিয়েছিল।

এই স্মৃতিটুকু নিয়ে হেঁটে যেতে হবে আমাদের

নিরপেক্ষ সময়ের অনিবার্য স্বেচ্ছাচারিতায়
ক্ষয়ে গিয়ে, তবু
গ্রীষ্মে শীতে মোহহীন কঠিন সারিতে
এই পথে, স্বপ্নের মায়া-লাগা, তবুও বাস্তবে
যার বহুমুখী বাঁক শুধুমাত্র ল'ড়ে যেতে বলে
অন্তহীন, একদিন নিশ্চয় হবে এই
আশাটুকু স্থির জ্বেলে রেখে

হেঁটে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে আমাদের।